ব্যাধি ও প্রতিকার।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

১৩১৩।

বরিশাল, আদর্শ যন্ত্রে শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও "ভারত সুহৃদ্"-প্রকাশক শ্রীঅনাথ-
বন্ধু সেন কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—আট আনা।

মুখবন্ধ।

যেদিন, আমাদের এই হতভাগ্য বরিশালে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মহাত্মাগণ ও অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত যুবকবৃন্দ অকারণে, রাজ-কর্ম্মচারীর অবৈধ আদেশে, অতি কঠোর ভাবে নিগৃহীত হইলেন; এবং যখন স্থানীয় "প্রাদেশিক সমিতি" ও প্রস্তাবিত "সাহিত্য-সম্মিলনে"র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারিল না, তখনি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকটে আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকগুলি মত প্রকাশ করেন। প্রধানতঃ, সেই সকল কথাই তাঁহার বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে, এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ হইল।

শিক্ষিত-সাধারণের নিকটে পঠিত হইবার নিমিত্ত ইহা কতকটা বক্তৃতার ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু, মাত্র "আর্থিক" আলোচনাটি ভিন্ন অন্য কোন অংশ গ্রন্থকার মহাশয় সভাস্থলে পাঠ করিতে পারেন নাই। তিনি গুরুতর রোগাক্রান্ত হওয়ায় পুস্তকখানির অন্যান্য অংশ অপঠিত ভাবেই মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম।

এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও মুদ্রণ-কার্য্য এতই অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাহিত হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে দু'একটা বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত হওয়া, নিতান্তই স্বাভাবিক।

তদ্ভিন্ন, এ পুস্তকের আদ্যোপান্ত গ্রন্থকার স্বহস্তেও রচনা করেন নাই। শারীরিক বিবিধ অস্বাস্থ্যনিবন্ধন ইহার অধিকাংশই তিনি মুখে মুখে রচনা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—আমি লিখিয়াছি। এইজন্ত, পুস্তকখানির স্থানে স্থানে পুনরুক্তি-দোষ থাকিতে পারে।

সহৃদয় পাঠকগণ তৎসমুদয় উপেক্ষা করিবেন, ভরসা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেন,
প্রকাশক।

উৎসর্গ।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্রের দৌহিত্র,

সরল,

স্বদেশ-প্রাণ, উদার ও কীর্ত্তিমান,

মদীয় শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ,

"সাহিত্য"-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহাশয়ের

করকমলে

উৎসৃষ্ট

হইল।

[illegible]

মঙ্গল-গীতি।*

তুমি তো মা, সেই—তুমি তো মা, সেই—চির-গরীয়সী, ধন্যা অয়ি মা,

আমরা শুধুই হ'য়েছি মা, হীন,—হারায়েছি সব বিভব-মহিমা।

তুমি তো মা, আছ তেমতি উচ্চ,—আমরা শুধুই হ'যেছি তুচ্ছ।

আপনার ঘরে হ'য়েছি মা, পর। জানিনা কি পাপে এ তাপ সহি মা।

এখনো তোমার গগন সুনীল,—উজল তপন তারকা-চন্দ্রে।

এখনো তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্রে।

এখনো ভেদি' হিমাদ্রি-মজ্জা উছলি পড়িছে যমুনা-গঙ্গা,

স্নেহ সুধারাশি ঢালিয়া শতধা তোমার হৃদয়ে যাইছে বহি' মা।

তুমি তো মা, সেই সুজলা-সুফলা।—এখনো হরষে ভাসায় নেত্রে

পুষ্প তোমার শ্যামল-কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে।

তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব। আমরা দুঃখী, আমরা নিঃস্ব।

—তুমি কি করিবে? তুমি তো মা, সেই—মহিমা-গরিমা পুণ্যময়ী মা!

---

* এই অতুল সঙ্গীতটি কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের রচিত।

সূচী।

অদৃষ্টের অধীনতা,   অবসাদ-নির্জ্জীবতা,

ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ কথা

নীরবে বিস্মরি',

নূতন বরষে আজ   তুচ্ছ করি' ভয়-লাজ;

জাগ্রত জগৎ-মাঝ—

এসো কাজ করি!

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত।"

২৪৮-৬

ব্যাধি ও প্রতিকার।

ভূমিকা।

যাহা যায় তাহা আর ফেরেনা,—ইহা পুরাতন হইলেও নিত্য-নূতন কথা। কারণ, যাহা সত্য তাহা পুরাতন হইলে জীর্ণ-মলিন হয় না ;—বরং, কালের অগ্নি-পরীক্ষায় তাহা ক্রমেই উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। আমরা জীবনের যে অংশটুকু হারাই, সে সময়টুকু আর ফিরিয়া আসেনা,—তাহা গেল তো চিরদিনের মতই গেল। এইজন্যই মানুষ অতীতের চিন্তায় সুখ পায়।

যখন আমরা বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের মধ্যে বিচরণ করি, তখন আমরা বর্ত্তমানের মর্য্যাদা বুঝিতে উৎসুক হই না। কিন্তু, যখনি বর্ত্তমান অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যায় তখনি হৃদয় তাহার অভাব বোধ করে, এবং তখনি আমরা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিয়া থাকি। এইজন্য বর্ত্তমানের অপেক্ষা আমরা অতীতের বিষয় অবিকৃত ইষ্টরূপে, নিরপেক্ষভাবে

চিন্তা করিতে পারি। তাহাকে এখন আর ফিরাইবার উপায় নাই—সে এখন আমাদের নিকটে দুর্লভ হইয়া গিয়াছে, এই চিন্তাতেই আমরা তাহাকে অধিকতর আন্তরিকতার সহিত অনুভব করিবার অবসর প্রাপ্ত হই।

কিন্তু, মানব-জীবনে বর্ত্তমানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া, আবশ্যক। মানুষ হইতে হইলে বর্ত্তমানকে বিশেষভাবে চেনা, দরকার। যাহাকে লইয়া আমরা রাতদিন নাড়াচাড়া করিব তাহাকে অপরিচিতভাবে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আত্মোন্নতি করিতে হইলে নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত করা, অত্যাবশ্যক।

কিন্তু, বর্ত্তমানকে চিনিতে হইলে আমরা অতীতের ভিতর দিয়াই তাহাকে প্রোজ্জ্বল করিয়া দেখিব। এখানেও আমরা অতীতের হাত এড়াইতে পারি না। বাস্তবিক, অতীতকে ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যাই। প্রত্যক্ষ বা বর্ত্তমান অনেক সময়ে আমাদিগকে প্রতারিত করে,— তাহার স্থায়িত্ব-গৌরব জানিবার জন্য আমরা তাহার কাছে অতীতের পরোয়ানা দেখিতে চাই। যে চিত্র বর্ণ-বৈচিত্রে অত্যন্ত জাঁকালো তাহা আমাদের নয়ন-রঞ্জন হইলেও, আমরা তাহার প্রকৃত মূল্য-নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে সেটা কাহার কর্ত্তৃক অঙ্কিত, তাহা জানিতে উদ্‌গ্রীব হই,—আর্টিষ্ট ডিয়ো, না র‍্যাফেল্ তাহার

জন্মদাতা,—সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে একবার অনুসন্ধান লওয়া, প্রয়োজন হইয়া পড়ে। রোগটা কি, জানিতে হইলে শুধু রোগীকে, দেখিলেই চলিবে না,—তাহার রোগের অতীত-কারণ-নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা না হইলে রোগীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিকিৎসক কিছুই করিতে পারেন না।

তাই, অতীত শুধু যে বর্ত্তমানের তাহা নহে,—সেই সূত্রে ভবিষ্যতেরো নিয়ামক। অতীতের কর্ম্মফল আমাদের বর্ত্তমানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া দেয়।

আজ বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমার এই চিন্তাটা বারবার করিয়া মনে আসিতেছে। আমরা জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখে নিয়ত আত্ম-হারা হইয়া অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কোন চিন্তাই করিতেছি না। কিন্তু, এ চিন্তা না করিলে আমাদের আর উপায় নাই। "চোখ-ঢাকা বলদের মত" আমরা অনেক দিন ঘুরিয়া দেখিলাম। কিন্তু, আর পোষায় না। নিজেদের গায়ের রক্ত জল করিয়া, কলুকে যে খাঁটি তেলটুকু বাহির করিয়া দিলাম,—তাহার পরিবর্ত্তে ল্যাজমলা ও বেত্রাঘাত ব্যতীত বড় কিছু লাভ করি নাই। এখন এ চোকের ঢাকনি খুলিবার সময় আসিয়াছে।

আমরা এখন এমন একটা সঙ্কটাপন্নস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যেখান হইতে পদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আমাদের গন্তব্য দিক-নির্ণয় করা, আবশ্যক। কিন্তু, চিন্তাদ্বারা লক্ষ্য স্থির করিয়া,

তবে চলিতে আরম্ভ করিব। নতুবা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা করা, সম্ভবপর হইবে না। শাস্ত্রকারগণ জীবনকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রতী হইবার পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে হইবে। কারণ, চিন্তা কর্ম্মের জন্মদাত্রী হইলেও চিন্তা ও কর্ম্ম এক নহে। সঙ্কল্পিত কর্ত্তব্যকর্ম্মে রত হইয়া, সঙ্কল্প-বিরোধী চিন্তাকে তৎসহ যোগ করিলেই সে কর্ম্মের প্রাণবিয়োগ হয়,—তাহার তখনি গতি-শক্তি রহিত হইয়া পড়ে।

আজ এই নববর্ষে মনে হইতেছে,—এই যে বৎসরের পর বৎসর আসিল গেল, ইহার মধ্যে আমরা কতখানি অগ্রসর হইলাম? পৃথিবী তো নিত্যই নবস-নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে-ছেন, কিন্তু, ইতিমধ্যে আমাদের জীবনে কি কোন নূতন আশার সমাচার আসিয়াছে? তাই, আজ এই ব্যাকুল মন স্মৃতির আলোকে আমাদের সুদূর অতীতের ভগ্নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, চিন্তাবুদ্ধির সাহায্যে আমাদের কৃতকর্ম্মের দলিলপত্র খুঁজিতে আসিয়াছে। আমাদের দুর্দ্দশার প্রকৃত যে কারণ অতীতের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তৎপ্রতি আমার মন অবস-কুতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহে।

এই অন্বেষণের ফলে একটি সর্ব্বজন-বিদিত, প্রধান কারণ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সেটি—**একতার অভাব।**

গীতার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে কি অবস্থা ছিল তাহা এখন আর নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই। কিন্তু, যেটুকু জানা যায় তাহাতে আমার বিশ্বাস—তৎপূর্ব্বেই ভারত আপনার জ্ঞান ও ধর্ম্ম-গৌরবে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে নিজকে মহিমান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কারণ, যে অস্পষ্ট, অতীত যুগ ভীষ্মার্জ্জুন-যুধিষ্ঠিরের জন্মদান করিয়া, বেদ, উপনিষদ্ ও গীতার মধ্যে স্বীয় মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছে তাহাকে জগতের ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ যুগ বলিতে আমাদের ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে,—সে গর্ব্বিত অধিকারটুকুকে খর্ব্ব করিবার ধৃষ্টতা কাহারো নাই।

কিন্তু, ইহার পরে গীতার যে যুগ আসিল—আমার বিশ্বাস—সেই সময় হইতেই আমাদের পতন আরম্ভ হইয়াছে। গৃহ-বিবাদ যে কুরুক্ষেত্ররূপ মহাসমর-বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিল—আমার ধারণা—সেই সমরেই আমাদের জাতীয় জীবনের অবসান হইয়া গিয়াছে। সে সমরে ধর্ম্ম অধর্ম্মকে পরাজিত করিল বটে, কিন্তু, যখন সমর-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল তখন দেখিলাম,—ভারতের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মজয়ী হইয়াও আমাদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে, সে আর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার আশ্রয় খুঁজিয়া পায় নাই।

এই সমর-কোলাহলক্ষুব্ধ ভারতে, সমরান্তে একটা সুদীর্ঘ অবসাদের আবির্ভাব হইল,—এই অবসাদাক্রান্ত সময়ে আমাদের

আর কোনই জাগরণ-সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় না। এ সময়টা প্রকৃতই শ্মশানের ন্যায় তমসান্ধকারে স্তব্ধ হইয়া, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইহার প্রতি যখনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি তখনি শরীর ভীতি-কণ্টকিত হইয়া উঠে, এবং তখনি বলিতে ইচ্ছা হয়,—হায়,

সময়-বহ্নি "যবে অবসান
সোণার ভারত বিপুল শ্মশান!"

এই তমসাবৃত যুগের মধ্যে ছু'একবার একটু আশার আলো দেখিতে পাই। রাজর্ষি অশোক দেশ-ব্যাপী একটা শান্তি সংস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার সে চেষ্টাও অত্যন্ত ক্ষণিক,—তাহার তৈল অতি অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষে পুড়িয়া গেল!

অতঃপর, মুসলমানগণ দেশ আক্রমণ করিল। সেই আক্রমনের ফলে যে যুদ্ধ হইল তাহাতেই আমাদের সাধ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল। প্রথমে যে গৃহ-বিবাদ আমাদিগকে সর্ব্বনাশ ও ধ্বংশের পথে আনয়ন করিয়াছিল, আজ সে আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া বসিল; এবং দেশ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। মুসলমানগণ শুধু যে আমাদের দেশ অধিকার করিল তাহা নহে,—আমাদের মধ্যে তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া বসিল। এইখানেই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলাম!

মুসলমানদের আগমনের পর হইতে মুসলমান-রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমান ভারত-ইতিহাসের আদ্যন্ত জুড়িয়া কেবল অশান্তির ঝড় তুলিয়া রাখিয়াছে। সেই প্রবল বায়ু-প্রবাহে হিন্দুরা তাঁহাদের সমুদয় সদ্‌গুণরাশি উড়াইয়া দিয়া, একটা নির্জীব জড়তার মধ্যে আত্ম-সমাধি রচনা করিয়া লইয়াছে। এ পক্ষে আমি এখন শুধু ঔচিত্য-বিচার করিব,—সম্ভব-অসম্ভব বা স্বাভাবিকতার হিসাব আমি করিতে চাহিনা। কাজেই সে ভাবে বলি—এক্ষেত্রেও হিন্দুরা যথার্থ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে নাই। আত্ম-বিরোধের ফলে, আমরা যে মুসলমানগণকে ঘরে ঢুকিতে দিয়াছি তাহাদের সহিত পুনরায় বিবাদ করিয়া যে আমাদেরি অলাভ, তাহা আমাদের তখনো বোধগম্য হয় নাই। আমরা অদূরদর্শীর ন্যায় সিংহাসন তাহাদের অধিকারভুক্ত করিয়া দিয়া, আবার পরক্ষণেই তাহা কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু, ইহাতে বিপরীত ফল দর্শিল।—যখন মুসলমানগণ আমাদের দেশকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইবার জন্য এই দেশে আসিয়াই বস-বাস করিতে আরম্ভ করিল, তখনি তাহাদের সহিত আমাদের আপোষে নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া, আমরা পুনরায় গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত করিয়াছি। কিন্তু, এরূপভাবে দিন কাটিতে পারে না। তাই, আমাদের এই বিরোধের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, ইংরাজ-বণিক

প্রিয়দর্শন, গৌর-মোহনরূপে আমাদিগকে ভুলাইয়া, আমাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং অতি অনায়াসে এই বিপুল ভারতবর্ষ কুড়াইয়া করতলগত করিল।

ইংরাজের এই আগমন আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরম কল্যাণকর হইয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নদেশীয়দের শাসনাধীনে আপনাদের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ-প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমরা এই দুই জাতি—হিন্দু ও মুসলমান—সমস্বার্থভোগী। এখন আমরা পরস্পরকে আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

কিন্তু, চিরদিন কিছু সমান যায় না। হয় তো, এই ইংরাজই পুনরায় আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে। তখন আমাদেরি আত্ম-নির্ভরতার উপর—জাতীয় একতার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। এই সম্ভাবিত পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদিগকে এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা ইংরাজের জ্ঞানালোকে এখন হইতেই একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে যত্নশীল হইব। তাহা যদি না পারি,—যদি আমরা এই অবসরে পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে ঘনিষ্ঠ করিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিতে না পারি তবে ভারতের ভবিষ্যৎ অতি ঘোর বিভীষিকাময়,—একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

আমরা একদিন বড় ছিলাম,—এ অহঙ্কার তো অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিতেছি। কিন্তু, এখন যে আমাদের সবি

গিয়াছে তাহা আমরা একবারো ভাবিয়া দেখি নাই। তাহা যদি দেখিতাম,—আমাদের যদি সে জ্ঞান থাকিত তবে এ দুর্দ্দশার অবসান হইত, সন্দেহ নাই। আমরা যে দিন জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত ছিলাম সে দিন আর নাই। বহুদিনের সে কথা আজ স্বপ্নের মত আমাদের মনে রহিয়াছে মাত্র। যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিয়া পাইব না,—তাহা আজ আমাদের নিকটে শুধু আদর্শটুকু রাখিয়া, অতীতের মধ্যে দুর্লভ হইয়া গিয়াছে।

আজ সংক্ষেপে, অতীতের মধ্য দিয়া, আমরা বর্ত্তমান ও তৎ-সাহায্যে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আসিলাম। বুঝিলাম, আমাদের এ দুরবস্থার সর্ব্বপ্রধান কারণ—অনৈক্য বা বিরোধ।

বন্দে মাতরম্!

আত্ম-চিন্তা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দুর্দ্দশার মূল কারণ—অনৈক্য। এখন এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অনৈক্য ঘটে কেন? ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি?

এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এক কথায় দেওয়া, অসম্ভব। তবে, সংক্ষেপতঃ ইহার কারণ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মানবের মনোগত বুদ্ধিবৃত্তি ভ্রান্তির মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া, যখন তাহার আত্ম-শক্তিকে সংযম-সীমার বহির্ভূত করিয়া দেয় তখনই বিরোধের—কলহের ও ব্যবধানের সূত্রপাত হয়। অনৈক্যের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ —অসংযত শক্তি। সত্যই, চিন্তা করিলে দেখিতে পাই—গীতার যুগ হইতেই আমাদের মধ্যে অসংযত শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে; এবং তজ্জন্য, তখন হইতেই আমরা অধঃপতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছি। কিরূপে এই ভ্রান্ত বুদ্ধি-পরিচালিত শক্তি অসংযত হইয়া, আমাদের মধ্যে একতার অভাব আনয়ন করে

তাহার দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিবার জন্য আজ আর আমাদের কোনই শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। আজ এই অভিশপ্ত বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে ভ্রাতৃবিরোধের যে মহাচিতাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে, একবার তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলেই আমরা এবিষয়টি সহজেই হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিব ,—উচ্ছৃঙ্খল আত্ম-শক্তি কিরূপে আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছে, গৃহের পানে চাহিলেই তাহা আমাদের হৃদয়ে জলদক্ষরে মুদ্রিত হইয়া যাইবে। আজ যে পরের উপরেই আমাদের এই ত্রিংশ কোটী জীবন অসীম নির্ভর করিবা, নীরবে দাসত্বের ভারা মাথায় বহিয়া, নিষ্কাম ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—তাহার মূল কারণ এই যে, আমাদের ভিতরকার আত্ম-শক্তি এখন আর আমাদের স্বগত নহে ;—সে আজ বহুদিন হইল অস্থির-উদ্দাম হইয়া, আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া, আমাদের মধ্যে দুরপনেয় ব্যবধান ও অনৈক্যের সূত্রপাত করিয়া, একান্ত দুর্লভভাবে অজ্ঞাত স্থানে লুক্কায়িত হইয়াছে। শক্তিকে যদি অভ্রান্ত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা আমরা পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রিত রাখিতে পারিতাম তবে আজ আর আমাদের এ অসহ অদৃষ্টের উপহাস সহ্য করিতে হইত না।

কিন্তু, সেই অতীতের জন্য হাহাকার করিয়া এখন লাভ নাই। বর্ত্তমানে আমাদের কি কর্ত্তব্য, সম্প্রতি তাহাই স্থিরীকৃত করা, প্রয়োজন। অধুনা, আমাদের সর্ব্ববিষয়েই অসংখ্য করনীয়

আছে, এবং প্রধানতঃ মানব-জীবন ধারণের পক্ষে যে কয়টি সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অভাব, সে গুলির প্রত্যেকটির প্রতিই আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইহা গৃহে বসিয়া, উদ্ধমাত্র তাম্বুল-বাগরঞ্জিত ওষ্ঠে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে, মৃদু হাসিয়া, লীলাময়ী অঙ্ক-লক্ষ্মীর 'ঢল ঢল', কমনীয় চন্দ্রাননের সহিত প্রেমালাপ করিবার কার্য্য নহে। এ জীবন-মরণের কথা,—এ অস্তিত্ব-চিন্তার শেষ পরামর্শ,—এ মুমূর্ষ প্রাণীর সর্ব্বশেষ আলোচনা। এই সম্পর্কে, এ কথা আমরা কি তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি? এই চিন্তা কি আমাদের তেমন করিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে?

আজ যে জাপান এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এতদূর উন্নত হইয়াছে, আজ যে সে এ জগতের মধ্যে অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি-রূপে পরিগণিত হইয়াছে, আজ যে মদ-গর্ব্ব-স্ফীত ইংরাজ বারং-বার তাহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য—একটু সখ্য লাভের আশায় লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার যথার্থ হেতু কি? ইহার হেতু এই যে, জাপানের এই জয় আন্তরিকতা-মূলক, তাহার এই উন্নতি-চেষ্টার মধ্যে তন্ময়তা আছে, অতৃপ্তি আছে,—জীবনী-শক্তি আছে। তাহারা যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া, কেবলমাত্র ঘনঘন প্রবন্ধ লিখিয়া, করতালি সংগ্রহ করিয়া, কিম্বা পরের প্রতি অশ্রাব্য ভাষায় গালি বা বিদ্রূপ বর্ষণ পূর্ব্বক বিদেশী ভাষায় গলা-

বাজি করিবাই দিন কাটাইয়া দেয় নাই। তাহারা প্রত্যেক জীবনে সরলতা ও সমপ্রাণতা, শিক্ষা ও কর্ম্ম একত্রীকৃত করিয়া, কঠোর সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশের ও দশের হিতে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিয়াছে। তাই, আজ তাহাদের এ মহত্ত্ব;—তাই, আজ তাহারা বিশ্বের বিস্ময়-কেন্দ্ররূপে উদীয়মান অরুণালোক-প্রদীপ্ত, সুবর্ণ-কিরীট, অত্যুচ্চ, অচল অটলের ন্যায় মহোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

জনৈক বিখ্যাত জাপানী বলিয়াছিলেন যে,—"তোমরা অত বক্তৃতা কর কেন? আমরা তো কখনো আমাদের জীবনে এত সভার কল্পনাও করিতে পারিনা। যাহা সত্য বলিয়া একবার বুঝিব তাহাই তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিব। শতবার এক কথার পুনরুক্তি করিলে, তাহাতে তোমাদের বিরক্তির উদ্রেক হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য! অতবার যদি মূল্যবান কথাকে উচ্চারণ করিতে হয় তবে সে কথার মধ্যে প্রাণ থাকে না। শেখো, বোঝো, আর কর।—এরূপ না হইলে উন্নতি হইবে না।" আমি সে কথা শুনিয়া নত-শির হইয়া পড়িলাম। কথাটি প্রথম কর্ণগোচর হইবামাত্র আমার তন্মুহূর্ত্তে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। কর্ম্মবীরের এই বজ্র-গর্ভ উক্তির মধ্যে কি সংহত তেজোগর্ব্ব! কি চিরস্থির, অমলিন, অচপল নিষ্ঠা! এমন প্রাণ না হইলে জাতি হইতে পারে? একি মদ্যপের

'সখের জলপান' খাওয়া ?—অত সোজা নহে।—অত সহজে মানুষ হওয়া যায় না।

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, "আমরা পরাধীন জাতি—আমাদের পক্ষে জাপানীদের ন্যায় সহজে কর্ম্ম-ব্রতী হওয়া ও সাফল্য লাভ করা, সম্ভবপর নহে।" কিন্তু, এ আপত্তির কতক পরিমাণে সারবত্তা স্বীকার করিয়াও আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, যে সকল বিভাগ কতকাংশে আমাদেরি কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে, যে সকল কর্ম্মে আমরা এখনো কতকটা স্বাধীন, আমরা সেই সকল দিকেও কি কোন স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারগ হইয়াছি ? আমাদেরি আয়ত্তাধীন কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে আমরা উদাসীন রহিব ; অথচ সভা ডাকিয়া বিদেশী, সহানুভূতি-হীন ইংরাজের প্রতি তীব্র ভাষায় উত্তেজিত কণ্ঠে, অজস্র দোষারোপ করিব,—ইহা হাস্যকর কাপুরুষতা।

আমাদের যে সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য উন্নতির পথে আমরা অদ্যাপি উন্মুক্ত, আমি সেই সকল সম্বন্ধেই আমার এই প্রবন্ধে অনতি-বিস্তৃত একটু আলোচনা করিতে চাই। ভরসা করি—পাঠকবর্গ আমার উক্ত মতামতের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমরা মুখ্যতঃ, এখনো অল্প-বিস্তররূপে তিনটি ধরণে স্বাধীন আছি। যথা—

(ক) আর্থিক।

(খ) সামাজিক।

(গ) নৈতিক ও পারমার্থিক।

এই তিনটি বিষয়ে এত শিক্ষিত হইয়া, এত সারগর্ভ, উপদেশাত্মক বক্তৃতা করিয়া, এখন নিজেদের যত্নে ও অধ্যবসায়ে আমরা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা, দরকার।

আলোচনা।

(ক) আর্থিক।

প্রথমতঃ, আর্থিক অবস্থাপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, এতকাল আমরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্বিগ্নমনা ছিলাম, সম্প্রতি তবুও একটু তদ্বিষয়ে সজাগ হইয়াছি। কিন্তু, ঐ বিন্দু পরিমাণ চৈতন্য-লাভই সার,—প্রকৃতপক্ষে, কার্য্যতঃ আমরা অদ্যাপি বিশেষ কিছু করি নাই। এতদিন আর্থিক উন্নতি বলিতে আমরা কেবলমাত্র চাকুরি করাই বুঝিতাম। আজ না হয় মানি—সে ভাবের মোহটা আমাদের কিয়ৎপরিমাণে ঘুচিয়াছে। কিন্তু, চাকুরি না করিয়া কোন্ সদুপায়ে আমরা উন্নতি লাভ করিব? সকলেই কিছু স্বাধীন ব্যবসায় অর্থে ওকালতি করিতে পারে না,—আর, সে ক্ষেত্রেও অধুনা সদর মফস্বলে প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে। তবেই, আমরা এখন করিব কি? আজ যে যখনতখন কথায়কথায় আমরা লোককে চাকুরি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেই,—ততদূর মনোবল হইয়াছে বলিয়া মনে না করিলেও, না হয় তর্ক-স্থলে বা [illegible]—আজ যদি সেই উপদেশেই আমার দেশবাসিগণ দাসত্ব ছাড়িয়া দেন তবে তাঁহাদের উপস্থিত আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য আমরা কি আয়োজনটা করিয়াছি। কেবল কাব্য-কুক্ষিগত ভাব-প্রবণতায় দেশোদ্ধার করা যায় না। ভাব যদি কার্য্যের প্রাণরূপে জাতীয় জীবনে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ না হয়,—যদি সে কর্ম্মের সারথিরূপে কর্ম্মের গতিকে উৎসাহের স্বর্ণ-কুহক-যষ্টি-স্পর্শে-

ক্ষিপ্রতর ও অধিকতর জীবন্ত করিয়া না তোলে তবে সে ভাব-প্রবণতায় আমাদের বর্ত্তমানে কোনই স্থায়ী প্রয়োজন-সিদ্ধি বা উপকারের আশা নাই।

এই যে স্বদেশী আন্দোলন—যাহা বাস্তবপক্ষে আমাদের এই জীর্ণ জাতীয় জীবনের শোণিতের সংস্থান-প্রয়াস,—তাহার আরম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমরা অবসাদ-পরিণাম উত্তেজনা প্রকাশ ভিন্ন কতখানি স্থায়ী শুভের—কোন্ প্রত্যক্ষ উন্নতির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি ?

আমরা আদ্যন্তই ভ্রান্তি-মুগ্ধ রহিয়াছি। স্পষ্টতঃ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেও একথা সত্য যে, আমাদের মনে এখনো দৃঢ়রূপে এ ধারণা বদ্ধমূল আছে যে,—ইংরাজ দেবতা, সে শুদ্ধ আমাদের পরিত্রাণ-কামনায়, আমাদেরি সর্ব্বাঙ্গীণ হিত-করে, সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে এদেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু, এ কি অসাধারণ আত্ম-বিভ্রম! অনেকে হয় তো এ কথা অস্বীকার করিবেন, কিন্তু, সে তাঁহাদের লজ্জাপনোদনের জন্য শারীরিক শক্তি-প্রকাশ বা 'গায়ের জোর'। কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ এ কথা স্বীকার না করিয়া পারেন যে, আমরা ইংরাজকে বিশ্বাস করি বলিয়া—তাহার বিচার, শাসন ও ধর্ম্ম-প্রাণতায় অনন্ত আস্থা স্থাপন করি বলিয়াই, আজ আমরা তাহাকে পদে পদে মন্দ বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ

করিবার—আত্ম-প্রবঞ্চনায় তৃপ্ত হইবার—আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া গৌরব করিবার জন্য প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি? তাহাকে দেবতা মনে না করিলে তাহার অবিচারে আমরা এত অধীর; এত চঞ্চল হইয়া উঠি কেন? আমাদের স্থির জানা উচিত—ইংরাজ পরিত্রাণ করিতে বা ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে এদেশে আসে নাই। ইংরাজ তাহার কথায়, কার্য্যে, আচারে, ব্যবহারে তাহারা যে জেতা এবং আমরা যে বিজিত,—তাহার শত সহস্র, জ্বলন্ত প্রমাণ শিক্ষা দানে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া, আমাদের সেই জ্ঞানোন্মীলিত চক্ষের সমক্ষে ধরিতেছে; এবং আমাদের চেতনা সম্পাদন করিবারো নানা উপায় বিধান করিয়াছে।

যখন চঞ্চল-মতি বিচ্ছিন্ন বঙ্গের ভাগ্য-বিধাতা, স্যার ফুলারের প্রতিনিধি এমার্সন মহাপ্রভুর ন্যায় নগণ্য তুচ্ছ ব্যক্তি—যাহার স্বদেশে মাথা গুজিবার একটা 'চাল-চুলা'ও আছে কিনা, জানি না।—আমাদের দেশ-পূজ্য, বিশ্ব-মান্য সুরেন্দ্রনাথকে বিনা কারণে, অবৈধ ভাবে, অপমানিত করে, যখন নিরীহ, নিরস্ত্র, শত সহস্র, গণ্যাগ্রগণ্য প্রতিনিধিবর্গকে অকারণে কেম্পের ন্যায় একজন ইংরাজ যথেচ্ছ ভাবে, বর্ব্বরতার দ্বারা নির্য্যাতিত করিতে সাহস পায়, যখন শিকারোপলক্ষে ইংরাজের নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলি অথবা সহসা সুপ্তোত্থিত শ্বেত-চর্ম্মের সবুটপদাঘাত শোষ্ণ-

 আর্থিক।

ক্লিষ্ট, নিশ্চিন্ত, ভারতবাসী কৃষক ও কুলিকুলের জীবন নিঃশেষ করিয়া দেয়, এবং যখন এই সকল নৃশংস, মমত্ব-লেশ-শূন্য ইংরাজদিগের দু দশটাকা জরিমানা ভিন্ন আর কোনই শাস্তি বহন করিতে হয় না,—তখনো কি আমরা বুঝিবার অবকাশ পাই না যে, আমরা চিরপদানত, বিশ্ব-ঘৃণ্য নফরের জাতি? আজ তাহা যদি আমরা বুঝিয়া থাকি—যদি আমরা স্বেচ্ছায়, আত্ম-দোষে, সাধ করিয়া নফরগিরিকেই জীবন-যাপনের শ্রেষ্ঠ পন্থারূপে বরণ করিয়া লইয়া থাকি তবে বিদেশীদের কি অপরাধ? তাহারা তো শত প্রকারেই আমাদের ক্ষণে ক্ষণে জানাইয়া দিতেছে যে, আমরা দাসের জাতি গোলামের গোলাম, এবং তাহারা আসিয়াছে আমাদিগকে শাসন করিতে, আমাদিগকে শোষণ করিতে, আমাদের উপর স্বাধিকার বিস্তার করিয়া প্রভুত্ব করিতে।

তাহাদের আইন তাহারা নিজে পালন না করে ত' আমরা কি বলিতে পারি?—সে তাহাদের খেয়াল, তাহাদের সখ। তাহারা তাহাদের 'মর্জ্জি'-অনুসারে আমাদের অদৃষ্ট ভাঙ্গিবে, গড়িবে,—সে তো শুদ্ধ তাহাদেরি ইচ্ছানিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে, এ গালি বর্ষণ করি কাহাকে? এ শ্লেষ বর্ষণ করি কি জন্য? কাহাদের প্রাণে করিবে কোন্ সংস্পর্শ?—তাহাদের আইন আমাদিগকে রক্ষা করিবে, এই ভরসাতেই কি আমাদের

এরূপ রাজ্যাকর সাহস নহে ? আজ যে আমরা বরিশালের নিয়ন্তা এমার্সনের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করি বা স্বয়ং ফুলারে লাটকে কটু বলি সে সাহসের নীচেও কি প্রচ্ছন্ন ভাবে, পরোক্ষে আমরা ইংরাজের আইনের উপরেই নির্ভর করিতেছি না ?

এখানে কথা উঠিতে পারে যে, "আমরা তাহাদিগকে বিশ্বাস করি বলিয়া গালি দেই না, তাহারা মিথ্যা কহে বলিয়া,—সাম্য-নীতি মুখে প্রচার করিয়া, কার্য্যে তদ্বিপরীতাচরণ করে বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে গালি দেই।" কিন্তু, সে কথার উত্তরে আমি বলি—শাসনের সুবিধার্থে এই কয়েকজন মন্ত্রিসেই রাজ যদি আমাদিগকে এই স্তোক্বাক্যে ভুলাইয়া রাখে, নিজেদের রাজ্যের রক্ষণ শাসন-শোষণাদির পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়াই বোধ করে তবে আমাদের কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? যে আমরা যে, কথা কহিব ? আমরা কি "নিজবাস-ভূমে পরবাসী" নহি ? আমরাই কি "পর-দাসখতে সমদায়" দিয়া, স্বেচ্ছায় সংহোদরকে গৃহ-বিতাড়িত করিয়া, তাহাকে আজ পথের কাঙ্গাল, মাঠের কাথাকরূপে দুঃসহ দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করিতে বাধ্য করি নাই ?

এ কথার উপরে অনেকে কহিবেন 'যখন ইংরাজ রাজ্য-রক্ষার জন্য এই পীড়ন-নীতি গ্রহণ করিয়া, স্বকৃত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে তখনি তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইংরাজ

আর্থিক

আমাদিগকে ভয় করে, এবং এই পীড়ন-নীতি বা বে-আইনি কার্য্যসমূহ তাহার সেই ভীতি-প্রসূত।" আমি এ তর্কের যাথার্থ্য আংশিক মানিতেছি;—একথা মানি যে, ইংরাজ সময়ে সময়ে আমাদিগকে ভয় করে। কিন্তু, তাহাতে আমাদের যোগ্যতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ যে আমাদিগকে ভয় করে সে যোগ্যতার হিসাবে নহে,—তাহা সংখ্যার হিসাবে। মাত্র অল্প কয়েকজন ইংরাজ এই বিশাল ভারতের অগণ্য, জন-সমুদ্রকে শাসন-সংরক্ষণের দ্বারা স্থির, অচঞ্চল রাখিবার জন্য প্রবাসীভাবে ভারতবর্ষে আছে।—আমাদেরি হাতে তাহাদের বন্দুক-গুলি, রসদ, তহবিল। তাহারা আমাদিগকে দিয়াই আমাদিগকে শাসন করিতেছে। সুতরাং, তাহাদের মনে যে আশঙ্কা থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। প্রবাসী, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, সম্পূর্ণ বিভিন্নাচার ইংরাজের পক্ষে এমতাবস্থায় রজ্জুকে সর্প ভ্রম করা কিম্বা 'ঝোপে ঝাড়ে' ব্যাঘ্রমূর্ত্তি দর্শন করা, আদৌ অসম্ভব কি অস্বাভাবিক বলিয়া কোনই ধীরধী ব্যক্তি মনে করিবেন না। তজ্জন্য বলি, প্রয়োজনানুসারে ইংরাজ—ভয়েই হোক, আর নিজের সুবিধার জন্যই হোক,—নিজের কৃত বিধি লঙ্ঘন করিতে পারে ও করিতেছে। তাহাতে আমরা উহাদিগকে অমন করিয়া দোষ দিই কেন? এ দোষারোপ আমাদেরি বুদ্ধি-ভ্রংশ সূচিত করে।

বিরুদ্ধপক্ষ বলিবেন—"আমরা তো আর ইংরেজের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি না!—আমরা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছি; তাই, আমরা তৎপরিবর্ত্তে তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা ও আমাদের প্রাপ্য, ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে চাই।" কিন্তু, এ যুক্তি অগভীর। ইংরাজ যদি কৃতজ্ঞ না-ই হয়,—সে যদি তাহার 'দেয়' অধিকার আমাদিগকে না-ই দেয় তবে আমাদের কি বক্তব্য আছে? আমরা যে 'দেয়' শব্দ উচ্চারণ করি উহা তো ঔচিত্য-বোধক। যদি স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ইংরাজের সে ঔচিত্যজ্ঞান না থাকে! ইহার মধ্যেও কিন্তু সেই প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসের ভাবই জাগিয়া আছে।

কোন কোন বক্তাকে বক্তৃতার সময়ে চোক রাঙাইয়া বলিতে শুনিয়াছি—"সাবধান ইংরাজ। তোমার বড় 'বাড়' বাড়িয়াছে। এমন করিলে তোমার রাজ্য রক্ষা দুষ্কর হইবে।" কথাটার মধ্যে গৌণভাবে কিছু সত্য নিহিত আছে বটে। কিন্তু, সত্যের খাতিরে তবুও বলিতে হয়—সে পক্ষেও চতুর-চূড়ামণি ইংরাজ আমাদের এ কথার উপস্থিত, মর্ম্ম-নিহিত শক্তি অবগত আছে। সে স্বাধীন জাতি;—সে শক্তের স্বরূপ চেনে। তাহার নিকটে কপটতা করিয়া আমরা কোথায় যাইব? সে সাবধান হইবে কেন? আমাদের কথিত একতা যে কি, তাহার রাজ্যস্থাপনের সময়েই সে তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়া লইয়াছে।

আমার প্রতি কেহ অবিচার করিবেন না। আমি ইংরাজের

অবিমিশ্র গুণগান করিতেছি না, বা তাহাকে অত্যুক্তি-অলঙ্কারে ভূষিতও করিতেছি না। আমি শুধু এই বলিতে চাই যে, ইংরাজ যাহা করিতেছে তাহা তাহার পক্ষে ভ্রম হইতে পারে;—কারণ,—আমরা ইংরাজের ভয়ের বারণরূপে মন্ত্র হইতে পারি,—এমন যোগ্যতা আমাদের নাই!—কিন্তু, তাহা তাহার পক্ষে বিন্দুমাত্রও অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। সে দেবতা নহে—মানুষ, সে তো ভ্রমন করিবেই। ধর্ম্মানুগত হইয়া ইংরাজ এ দেশ জয় করে নাই; সুতরাং, সম্যক্ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা এ দেশে তাহার রাজত্ব রক্ষিত হইবে, এমত আশাও সে কল্পনায় আনিতে পারে না।

আমাদের এখন অনুভব করিয়া দেখা দরকার—আমরা নিজেরা কি করিয়াছি। পরে হাতে তুলিয়া দিবে, তবে খাইব,—এমন অদ্ভুত রীতি জাগ্রতের ধর্ম্মানুমোদিত নহে।

সকল কাজেই আমরা পরের সাহায্য চাই। অধিক কি, আমাদের শিক্ষাতে পর্য্যন্ত আমরা পর-মুখাপেক্ষী। আমরা ছেলেকে লেখাপড়া শিখাই কেন?—না, বাছা আমার বড় চাকুরী করিবে। সে চাকুরী দেয় কে?—ঐ ইংরাজ! শাসনে, রক্ষণে, জীবনে, মরণে,—অব্যাহতভাবে আমরা ইংরাজের মুখের দিকে আশার আঁখি মেলিয়া আছি। তাই, আজ এ দেশে—এ জাতির হিতার্থ, ইংরাজ যাহা করিয়াছে তাহাই হইয়াছে, যাহা সে করে নাই তাহা আজ সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

বন্দে মাতরম্!

ইংরাজ আমাদের যে হিত করিয়াছে বা করে তাহা তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। কারণ, সে তো হিত করিতে আসে নাই। সে যে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই আসিয়াছে! তবে, কোন্ স্বত্বে আমরা তাহার নিকটে এত অত্যধিক দুরাশা করিতেছি? আমাদের কি মনুষ্যত্ব আছে? হায়, তাহাই যদি থাকিত তবে নিজেদের কর্ত্তব্যগুলি—নিজেদের হাতের কাজগুলি—আজ আমরা এমন করিয়া অবহেলা করিতাম না! আমাদের সমাজ, আমাদেব মাতৃভাষা, আমাদের শস্যক্ষেত্র, আমাদেব গ্রামের জলাশয়, আমাদের শিল্পবাণিজ্যের এত দুর্দ্দশা কেন? কাবণ সেই একমাত্র।—কাবণ, ইংরেজ আমাদিগকে সে বিষয়ে বক্ষা করে নাই, সাহায্য করে নাই, তাই, আজ আমাদেব ঐ সকল বিভাগের শক্তিগুলিও ক্রমশঃ লোপ-প্রাপ্ত হইতে বসিযাছে! তাই বলি—যদি নিজেরা কিছুই না কবিব তবে বৃথা যেন আমাদেব সর্ব্বকর্ম্মেব কারণস্বরূপ ঐ ইংরাজকে মুখ নাড়িয়া, অনন্তকম্মা হইয়া কেবলি কটু না বলি।

সম্প্রতি আমাদের দেশেব কোন কোন গণ্য-মান্য লোক উন্নতিশীল গভর্ণমেণ্টেব আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে "হোমরূল" প্রথার প্রবর্ত্তন কবিয়া, শাসন সংরক্ষণেব ভার নিজেদেব হস্তে গ্রহণ করিতে এখনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন; এবং এপক্ষে, কয়েকজন উদারমতি, দেবতুল্য মহাপ্রাণ

ইংরাজের সাহায্যে বিলাতে একটি দল গঠন করিয়া, এখন হইতেই বাসনা পূর্ণ কবিবার আশায অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ফলে যে কি হইবে, জানিনা। কিন্তু, আমার বক্তব্য এই যে, "হোমরুল" পরিচালন করিবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহাই যদি থাকিবে তবে আমরা সালিশী সভায় আমাদের স্বদেশী নেতৃগণকেই বিচাবকরূপে বরণ না কবিয়া, ঘরে ঘরে কেন তবে গৃহবিবাদ-বহ্নি জ্বলন্ত রাখিয়া, আজো এই অনাশন-ক্লিষ্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ কাঞ্চনরাশি নজব-স্বরূপে বিদেশী রাজের চরণোপান্তে ঢালিয়া দিয়া, তাহার আদালতের দ্বারে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছি?—ইহা কি আমাদের একতার পরিচয়? একতার ভিত্তি বিশ্বাসে, সহানুভূতিতে, স্বার্থ-ত্যাগে! কিন্তু, এ তিনের একটি গুণো বস্তুতঃ আমাদেব নাই। আজ কি হিন্দু মুসলমানকে মানে?—না, মুসলমান হিন্দুকে মানে! এ সম্বন্ধে বঙ্গ-সাহিত্য-জগতেব রাজ-রাজেশ্বর, অমর ৺বঙ্কিম বড়ই সুন্দর একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন—'আজ যদি ইংবাজ ভারত ছাড়িয়া যায় তবে রাজা হয় কে? হিন্দু—না, মুসলমান।'

তাই বলিতেছিলাম—এখনো আমরা বহুবিস্তৃত কর্ম্ম-লোকের জন্য প্রস্তুত হই নাই। আমাদের নিজেদের যোগ্যতা থাকিলে আমরা আপনাদের হস্তগত কার্য্যগুলির আর এই প্রকার

দুরবস্থা দেখিয়াও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারিতাম না। আজ যে ইংরাজ অভাবে আমাদের শৃগাল-কুকুরের দুর্গতি হয়! আগে, ছোট কাজে হাত পাকুক্, তারপর ও সবের কথা ভাবিব। যে হতভাগ্য রোগীর পেটে চারি চামচ দুধ-বার্লিও সহে না তাহার পক্ষে ঝাল-ঝোল-সমন্বিত, ঘৃত-স্রাবী এই মাস-পলান্নের ব্যবস্থা কে করিতে পারে? খেয়ালে বা ঝোঁকের মাথায় একটা যথেচ্ছ প্রস্তাব করিলেই চলিবে না। আগে এক হইতে থাকি, যোগ্য হই, সমর্থ হই,—তবেই যেন এই দুর্ব্বহ দায়িত্বের ভার মস্তকে বহিবার কথা মুখাগ্রে আনি। এরূপ বিস্ময়জনক, সুখ-প্রীতিকর চিন্তা কবি-কল্পনার যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু, কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রাণ কল্পনার মধ্যে ইহার স্থান নাই। সর্ব্বকর্ম্মে—এমনকি চিন্তা ও চীৎকারে পর্য্যন্ত—সংযম না শিখিলে, ধৈর্য্য ও সামঞ্জস্য অভ্যাস না করিলে এ দেশের কোনই কল্যাণ হইতে পারিবে না।

অধুনা, এই যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে 'লায়ন সার্কুলার' উঠিয়া গেল,—আবার যে আমরা মাতৃনামোচ্চারণের অধিকার পাইলাম তাহার মূল কারণ কি?—আমরা আত্ম-সম্বৃত হইয়া, কথঞ্চিৎ যোগ্য হইয়া, ইংরাজের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং তাই, উহারা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমাদিগকে দিতে—ইচ্ছায় হৌক্ বা অনিচ্ছায় হৌক্—আজ বাধ্য হইয়াছে।

অতএব, আবার বলি—যোগ্য হইলে আমাদের সকলি মিলিবে। কিন্তু, যেন বৃথা পরের চোকে ধূলি দিয়া, আত্ম-বঞ্চনায় তৃপ্ত হইতে—আত্ম-হত্যা করিতে প্রবৃত্ত না হই।

বড় দুঃখে, বড় যাতনায়, বড় ক্ষোভেই এ সকল অপ্রিয় কথা বলিতে হইতেছে। কিন্তু কি করিব?—উপায় নাই। রোগ ক্রমেই অসাধ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে।

আজ এই যে বঙ্গদেশে এত আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে ইহার মূলে আমাদের ভাবপ্রবণ উত্তেজনা ব্যতীত আর কতখানি খাঁটি স্বদেশ-প্রেম আছে? কেবলি বক্তৃতা করা, স্বদেশী দ্রব্য কিনিবার ইচ্ছাকে মনে মনে পোষণ করা, বা অশ্রান্তকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ বলাই প্রকৃত 'স্বদেশী'র কর্ত্তব্য নহে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমাদের দেশে তবে কি এখনি সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে? আর কি বক্তৃতা করা কিম্বা 'বন্দেমাতরম্' বলার কোন প্রয়োজন নাই"? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি—আমাকে আপনারা ভুল বুঝিবেন না। আমি অবনত শিরে স্বীকার করি যে, আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অবোধ জন-সমষ্টির জন্য এখনো সভা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু, যাঁহারা শিক্ষিত—যাঁহারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে আর বুঝাইবার তত আবশ্যক, দেখি না। অতএব, যাহাদের দুর্দ্দশা যাহারা

নিজেরা বোঝে নাই তাহাদের পক্ষে দেশের জন্য কিছু না করিবার কারণ আছে, জানি। কিন্তু, যাঁহারা ব্যাপার বুঝিয়াছেন তাঁহারাও কি কিছু করিতে পারিতেন না? যদি পারেন তবে করেন না কেন? তাঁহারাও কেন তবে অপলক লোচনে ঐ ইংরাজেরি মুখ চাহিয়া আছেন? তাঁহারাও কেন তবে শুধু বক্তৃতা করাই জীবনের লক্ষ্যরূপে গণ্য করিয়া লইয়াছেন? ইহাও কি কাপুরুষতা-প্রতিপাদক নহে?

আমরা যে সকল খাঁটি কথাকে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের দ্বারা একণে মূল্যহীন, প্রাণহীন করিয়া ফেলিযাছি, এই প্রস্তাবে আমি সেই সকল কথারি নগ্ন প্রকৃতি-নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইলাম। আমি বলি—আসুন, অশিক্ষিত সাধারণেব বুদ্ধি-বিকাশেব জন্য বক্তৃতা করি, উত্তেজনা করি, উপদেশ দেই, এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও ভগবানকে স্মরণ করিয়া, সবল অন্তরে দেশেব সেবা করি। কাজেব বেনায়ই পিছাইয়া যাইব, আব বক্তৃতাব সময়ে জলদ-গর্জ্জন সহকারে বিচিত্র ভঙ্গী প্রকাশ করিব,—ইহাই কি সাধু, স্বদেশ-হিতার্থী, 'স্বদেশী'ব চিত্র? এ সকল কথা অনুভব করিবার—চিন্তা করিয়া বুঝিবার—কার্য্যে পরিণত করিবার; ইহা কেবল অবসব-যাপনেব জন্য দু'দণ্ড ধরিয়া, 'আরাম'-কেদারায় শুইয়া শুইয়া, সুখ-বিহ্বল, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে পড়িবাব কথা নহে। কায়মনোবাক্যে জানিতে হইবে—উপবে সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান

আছেন! নিজের অক্ষমতার ভাণ করিয়া, অন্তর্য্যামীর হাত হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই,—জো নাই যে, আমরা সর্ব্বদর্শী বিধাতাকে ঠকাইব!

কেহ কেহ বলেন যে, "আমরা দরিদ্র, যাহাদের সাধ্য আছে তাহাদিগকে এ সকল বুঝাইয়া হৃদয়াঙ্গম করানো হৌক্!" আমি এ কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। দরিদ্রেরো কি দেশের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই? যে যাহা পারি—যেরূপেই পারি—আমাদের আত্ম-শক্তি মায়ের কল্যাণ-কামনায় ও আমাদেরি অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য স্বদেশের সেবায় উৎসৃষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সকলেই যে লক্ষ টাকা মায়ের ভাণ্ডারে দিবে, আমি এমন অবৈধ আব্দার করি না। কিন্তু, যেহেতু আমার লক্ষ টাকা নাই অতএব আমি কিছু দিব না—কিছুই করিব না, শুধু 'বাক-বিদাম্বর' হইয়া, 'ফিরিঙ্গি'কে গালি দিব, আর 'দেশোদ্ধারক' 'নেতা' নাম কিনিব,—এমনি যদি ভীষণ অবস্থা হয় তবে এ 'স্বদেশী'র আগুন নিবিল বলিয়া,—সে বিষয়ে সন্দেহ করিবারো স্থান নাই! যিনি লক্ষ টাকা দিতে পারেন না তিনি তৎস্থলে যদি এক টাকা, চারি আনা অথবা চারি পয়সাও দিতেন তাহাহইলেও কি আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা—এ লজ্জা কতকাংশে ক্ষালিত হইত না? আমরা এই বাঙ্গলাদেশে সপ্তকোটী সহোদর আজিও জীবিত রহিয়াছি। প্রত্যেকে চারি পয়সা করিয়া দিয়াও

তো আজ অষ্টত্রিংশকোটি তাম্র-খণ্ডের সংস্থান করিতে পারিতাম! সেটুকু হয় না কেন? আমাদের এই 'স্বদেশী'র দৌলতে দাক্ষিণাত্যবাসিগণ আজ যে একরাশ কাপড়ের কল খুলিয়া ফেলিলেন।* তাঁহারা এজন্ত কয়টা জনাকীর্ণ সভা আহ্বান করিয়াছেন? কিন্তু, আমরা এ দেশে কি করিলাম? আমরা দেশী বস্ত্র পরিধান ও দেশী দ্রব্য খরিদ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি সত্য। কিন্তু, সে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করিবার কোন্ সুব্যবস্থা করিতে পারিলাম? যাঁহারা 'স্বদেশী'-প্রচারক বা বিদেশী-'বর্জ্জনে'র সমর্থক আমি তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি —তাঁহাদের সকলেই কি নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে মাতৃপদে প্রণামিস্বরূপ কিছু কিছু দিয়া ধন্য হইয়াছেন? তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বদেশ-প্রাণ, অতুলকর্ম্মী, সার্থকজন্মা কৃষ্ণকুমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন?

বোম্বাই এতগুলি কল খুলিল বলিয়া আমি দুঃখিত নহি;— আমি বোম্বাইকে বিদেশ বলিতেছি না। কিন্তু, তাহার অপেক্ষাও যে আমাদের ঘরের দুঃখ দূর করা, আগে চাই। দাক্ষিণাত্যবাসিগণ ধনী, তাহারা আমাদের ন্যায় দুঃস্থ নহে। ধনীর কাঞ্চন-স্তূপ ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে আমাদের এই ভাঙ্গা কুটীরের রিক্ত থলিটুকু ভরিয়া ফেলিতে হইবে।

এস্থলেও কথা উঠিতে পারে যে, "আমাদের এই আরম্ভ।

সুতরাং, উহাদের মত অত তৎপর হইব কেমন করিয়া ?" কিন্তু, তদুত্তর এই—তাহাদের দশটার স্থলে আমরা আজ দুইটারো তো চেষ্টা করিতে পারিতাম! তেমন অভিজ্ঞতা নাই ঠিক; কিন্তু, ক্রমশঃ ক্ষেত্রে না নামিতে আরম্ভ করিলে শক্তি আছে কিনা, কেমন করিয়া বুঝিব? বিফলতার মধ্যেই সফলতার বীজ গুপ্ত রহিয়াছে,—না হয় দুইচারিবার বিফলি হইলাম!—প্রয়াস ভিন্ন, উদ্যোগ ব্যতীত সে বীজ উপ্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়! আর, শক্তি নাই-ই বা কেন? তবে, হুজুক কমানো চাই, একটু ধৈর্য্যশীল হওয়া চাই, একটু যশোলিপ্সা হ্রাস করা চাই। মাতিয়া উঠিয়া আজ একটা কাজের অনুষ্ঠান করিলাম, আবার কালি স্বীয় স্বার্থ-গণ্ডীর মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া, অবজ্ঞাভরে তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম,—এরূপ হইলে চলিবে না। অধ্যবসায় চাই। আমাদের জাতীয় কর্ম্ম-পথে ঘোর অন্তরায় এই হুজুগ-প্রিয়তা, অস্থৈর্য্য বা চঞ্চলতা;—এই সকল বাধা-বিপত্তিকে অপসারিত করিতে হইবে।

কেহ কেহ আক্ষেপ করেন—"ও সব কিছু না। আসল কথা, আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, ইহাই আমাদের কর্ম্ম-ব্রতী না হইবার কারণ।" তবেই, সেই আগের কথাই তো আবার উঠিল—ঐ বিশ্বাস না করাও যা, বিরোধ বা একতার অভাবো তাই।

অর্থবান্ অপদার্থগণের মধ্যে মাননীয় ব্রজেন্দ্রকিশোর অথবা সুবোধচন্দ্রের মত মহাত্মা লোক এ দেশে এখনো প্রচুর জন্মান নাই বলিয়া, আমরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া, এমনি করিয়া ধরা-পৃষ্ঠের ভার-বৃদ্ধি করিব? তাহা হইলে এ দেশের কোনই দুর্গতি ঘুচিবার আশা নাই। আমাদের দেশে ধন-কুবেরেরা আমাদের কোন্ কল্যাণের জন্য, অদ্যাপি কবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন? এই সকল অধম জীবগুলির নিকটে আমরা তবু কেন আশা করি? যাহারা 'মী-লর্ড' ফিটানে চড়িয়া, নব-বিবাহিত বরের মছ্লন্দের তাকিয়ার মত আপাদমস্তক মখ্মল ও হীরকখণ্ডে মণ্ডিত করিয়া, চক্-মক্ করিতে করিতে, অচেতন তূলার স্তূপের ন্যায় মায়ের এই নিদারুণ দুঃখের দিনে কেবল মাত্র শূন্য-গর্ভ সম্মানের জন্য, পর-পদে তৈল মর্দ্দনার্থ ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময়ে, ফ্রান্স হইতে ইটালী হইতে আনিত, বিচিত্র বর্ণের নানাবিধ বেশ্যাগণের চরণে অজস্র অর্থ ঢালিয়া, মদ্যে জীর্ণ-তনু হইয়া, কাল কর্ত্তন পূর্ব্বক মানব-জন্মের চরম সাফল্যানুভব করিতে চেষ্টা করে তাহাদের আশায় উর্দ্ধ-মুখ, তৃষ্ণার্ত্ত চৈত্রের চাতকের ন্যায় চাহিয়া থাকিলে আমাদের কখনো কিছু হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। যাহা করণীয় তাহা আমরাই করিয়া লইব। একদিন তাম্বুল বা তাম্রকূট সেবন না করিলে আমাদের চলে,—হোক্ তুচ্ছ, আমরা সেই উদ্বৃত্ত অর্থই সপ্রেম-

প্রাণপূর্ণ করিয়া, মায়ের রাতুল পা'ছ'খানিতে ঢালিয়া দিব ; এবং আমি পূর্ণান্তঃকরণে বিশ্বাস করি,—আমাদের সেই নগণ্য ভক্তি-উপচারি আমার দুঃখিনী, অনাথা মায়ের অতুল সন্তোষ বিধান করিতে পারিবে।

এই প্রকারে, শুধু আর্থিক দানেই নহে—নানা উপায়েই আমাদের আত্ম-শক্তি স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমরা দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারি। আমরা যে আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আছি। সে কথা—সে নিষ্ঠুর সত্য এখনো কি আমাদের অন্তর স্পর্শ করিবে না? এখনো কেন আত্ম-বঞ্চনা দ্বারা তৃপ্ত হইতে চাই? আসন্ন প্রলয়-ঝটিকার গুরু গর্জ্জন কি এখনো আমরা শুনিতে পাইতেছি না? আমরা যেন অনুভব করিতে শিখি ;—তীব্র অনুভূতি সুপ্ত মর্ম্মকে জাগাইয়া না তুলিলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। আমাদিগকে অনুভব করিতে হইবে যে, কপটতা আত্ম-হত্যা। সরল না হইলে মাতৃ-পূজা করা যায় না। স্বার্থ-ত্যাগ চাই। স্বদেশ-হিতসাধন ভোগীর কার্য্য নহে,—তাহা ত্যাগীর কার্য্য। ইহা বিলাসীর সুখ-স্বপ্ন নহে,—ইহা বিরস-কঠোর তপস্যা! আত্মাহুতি ভিন্ন এ যজ্ঞের ফল-লাভ নাই।

কিন্তু, সে তপস্যা হইতে পাবক-পূত স্বর্ণের মত সকলেই যে প্রতাপসিংহ হইতে পারিবেন, আমি এ কথাও বলিতেছি না। শুধু এইটুকুই আমার বক্তব্য যে, যাহার যেটুকু ক্ষমতা—ঈশ্বরকে

সাক্ষী রাখিয়া, আমাদিগকে সরলভাবে তাহাই মায়ের পায় উৎসর্গ করিয়া, স্বার্থ-ত্যাগের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা যে প্রত্যেকেই মহাতপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিব, এবং সেরূপ ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধি লাভ হইল না বলিয়াই যে নিষ্কর্মা রহিব,—ইহা নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সাধ্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। সুতরাং, নিরাশ্বাসের কোন কারণ নাই। "অল্পানামপিবস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।"—ইহাই আমাদের এ নিরাশার আশা, এ অশান্তির সান্ত্বনা।

(খ) সামাজিক।

এখন সামাজিক অভাব সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিব। ভরসা করি, আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। বক্তব্যের বিস্তৃত বিবৃতি বা কর্ত্তব্যের সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে অন্যবিধ আয়োজনের প্রয়োজন,—সে দুঃসহ চিন্তাভার অচিরেই আপনাদের স্কন্ধগত করিতে সাহস করি না।

এই 'স্বদেশী'-প্রচেষ্টা উপলক্ষে আমার মনে হয় যে, আমরা যেন পঙ্গুর স্তায় অদ্বিতীয় চরণে খোঁড়াইয়া অগ্রসর হইতেছি। যেন এই জাতীয় জীবনে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গের মাত্র সাহায্য পাইতেছি,—অপরার্দ্ধের সহানুভূতি ও সাহচর্য্য হইতে অতি নিঃসহায়রূপে বঞ্চিত রহিয়াছি। এরূপ আধখানা দেহের সাহায্যে, ঐভাবে, এই অর্দ্ধভগ্ন প্রাণ লইয়া, আমরা—উন্নতি লাভ তো দূরের কথা—বহুদিন জীবিত রহিতেও পারিব না। কিন্তু, ইহার মূল কারণ কি? এই যে আমাদের এক মায়ের পেটের ভাইর সহিত অসংযত শক্তি-জাত অনৈক্য বা বিরোধ, ইহার অনাবৃত কারণ কি?

চিন্তা করিলে দেখিতে পাই ইহার মূলে, মুখ্যতঃ আমাদের সামাজিক পার্থক্য বহিয়া গিয়াছে।

এই বিশ্ব-সংসারে সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যেই জাতীয় স্বভাব বা প্রকৃতি চিরদিন প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আমাদের সমাজো এই এক অস্বীকার্য্য নিয়মের অন্তর্গত। সুতরাং, আমরা

যতই কেন সাধুতা প্রকাশ করি না—'কার্য্যেণ তদ্বিপরীতম্ প্রতিভাতি।' এভাবে, অন্তস্থ গ্লানি লইয়া একতার আশা করা, নিতান্তই বাতুলতা বলিয়া মনে হয়।

রক্তশীল 'সমাজপতি'র দল, আমাকে কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। আমি অকপটেই আমার অন্তরের কথা আজ—আমাদের এই আসন্ন প্রলয়-ক্ষণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে,—আমাদেরি মঙ্গল বিধানার্থ আপনাদের নিকটে ব্যক্ত করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, আপনাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছি। আমার যাহা ধ্রুব ধারণা তাহা আমি সঙ্কোচের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না। ভরসা করি, এই নিমিত্ত আমি অমার্জ্জনীয় অপরাধী গণ্য হইব না।

নদী গতিহীন হইলে যেমন তাহার চারিদিকে চর পড়িয়া আসে তেমনি আমাদের এই স্রোতোহীন, প্রাণহীন সমাজ-তটিনী ক্রমে চর-বেষ্টিত হইয়া, একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধ-কূপে পরিণত হইয়াছে। এই সমাজকে পুনরায় সংস্কারের দ্বারা যদি আমরা পরিষ্কৃত না করি তবে আমাদের আশা নাই,—ইহা অপ্রিয় সত্য কথা। অপ্রিয় সত্য বলিলে কিছু পাপ আছে জানি। কিন্তু, যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সে পাপভাগী হওয়া, দোষের বলিয়া মনে করি না। কবি বলিয়াছেন—

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;

যে জাতি জীবন-হারা, অচল, অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।"

কোন কোন সুশিক্ষিত, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেও বলিতে শোনা যায় যে, "আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে এক না হইয়াও রাজনীতি-ক্ষেত্রে একত্র হইতে পারিব না কেন ?—তাহাতে বাধা কি ?" কিন্তু, এ সকল ব্যাপারে এই 'কেন'র উত্তর দেওয়া, একটু কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, এ 'কেন' অনুভূতির বিষয়। এস্থলে, যুক্তি অথবা কূট তর্কচ্ছটা খাটিবে না।

'ওকি ঘরে আসিল ? ফেলো জল'! 'ওকি স্পর্শ করিয়াছে ? স্নান করিয়া পবিত্র হও ;—নতুবা, দেবতায়ো পূজা করিতে পারিবে না।' 'এঃ—ছিঃ, গাত্রোত্থান করিয়া মুখ দেখিলে ?—কর' ইষ্টমন্ত্র জপ দ্বাদশবার।'—ঐ সকল ব্যবহারের মধ্যেই যে আমাদের উত্তপ্ত বিদ্বেষের আগুণ সংহত রহিয়াছে, এই সকল আচারের প্রতিপালনরূপ ঘৃতাহুতির দ্বারাই যে আমরা সেই ঘৃণা-বহ্নি প্রজ্জ্বালিত রাখিতে নিয়ত তৎপর রহিয়াছি, এ কথা কি অতি সত্য নহে ? যাহাদিগকে প্রতি পদে আমরা এমনি করিয়া পৃথক্ রাখিতেছি তাহাদের নিকট হইতে আমরা কখনো কোন কার্য্যে সর্ব্বান্তরীণ, অকৃত্রিম সহানুভূতি লাভ করিতে পারিব না, ইহা সুনিশ্চিত।

সম্প্রতি সমাজের এ সকল গর্হিত আচার ও ব্যবহার (যথা—

আহারগত জাতিবিচার, বাল্যবিবাহ, পণ-গ্রহণ, কৌলিন্ত প্রভৃতি প্রথার) সর্ব্বথা সম্ভবপর না হইলে, এখন হইতেই অল্পে অল্পে, এ সকলের অন্ততঃ আংশিক উচ্ছেদসাধন, এবং সমুদ্র-যাত্রা প্রভৃতি প্রথার প্রবর্ত্তন,— শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেরি কর্ত্তব্য।

আমি আমাদের সমাজের প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেই না। কারণ, মর্ম্মের সে কোমল স্থানে আঘাত করিয়া বেদনা দিলে প্রাণ বাঁচিবে না! আমি ব্যবহারিক জীবনের কোন কোন আচার-পদ্ধতির সংশোধনের— পরিবর্জ্জনের ও প্রবর্ত্তনের কথাই এক্ষেত্রে বলিতেছি।

বিরুদ্ধ মতাশ্রয়ীরা প্রতিবাদ করিবেন—"সমাজ তো শুধু শিক্ষিত লোকদের নহে, উহা সাধারণের। কাযেই, শুধু শিক্ষিত লোকেরা ঐরূপ করিলে কি হইবে?" আমি বলি—সমাজের ভিতরে থাকিয়া, শিক্ষিতেরা ধীরে ধীরে সাধারণ লোককে উপযুক্ত করিতে থাকুন; এবং সেই সঙ্গে, নিজেরাও একটু অতি সামান্য মনোবলের পরিচয় দিয়া, নিজেদের এই সকল সদুপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইতে অগ্রসর হৌন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভ করিয়া মিলিতে মিশিতে পারিলে, সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবে,— ইহাই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কিন্তু, দুর্লভ হইলে চলিবে না,—তুচ্ছ করিলে চলিবে না,—তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন

করিলেও চলিবে না। সমপ্রাণতাই বশীকরণের অব্যর্থ মহামন্ত্র, এ কথাটি এস্থলেও মনে রাখা, অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেকে বলিতে পারেন যে, "সময় হইলে, ধীরে ধীরে, আপনা হইতেই এ সকল পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িবে। এ বিষয়ে, কোনরূপ ব্যস্ততা, সুপরামর্শ নহে।" আমি বলি—দিন আসিলে যে হইবে, অদৃষ্টের প্রভাব যে মনুষ্য-জীবনে আছে, তাহা ঠিক। কিন্তু, দিন অন্য ভাবেও আসিতে পারে,—চির-নির্ব্বাণ দানের জন্য! বিনা সাধনায় কাহার কবে ধ্যেয় বস্তু মিলিয়াছে? সেই সময়-প্রবাহকে পুরুষকারের দ্বারা যথাসম্ভব শীঘ্র আমাদের অনুকূলে বহাইয়া আনিব;—'উদ্যোগী পুরুষ-সিংহে'র ইহাই কায। সর্ব্ব-বিষয়ে দৈবানুশাসন মানিয়া চলা, অথবা অনুকূল কালের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা, কর্ম্মীর কর্ত্তব্য নহে,—তাহা তামসের আলস্যের বা নৈতিক বলের অভাব প্রমাণিত করে মাত্র। দৈববল সর্ব্বথা মানিতে হইলে আমরা আহার, বিহার, চিন্তা, পরামর্শ,—এ সব করি কেন? যেখানে পুরুষকারের প্রভাব দৈবকে কিঞ্চিদপি পরাস্ত না করে সেখানে বুঝিতে হইবে যে, সেই পুরুষকারের মধ্যে যথোপযুক্ত শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই, অথবা, যে পরিমাণ বলের দ্বারা, বা যে সদুপায়ে উক্ত দৈবকে অতিক্রম করা যাইত, সে পুরুষকারের চালনায় আমাদের সে সকলের অভাব ঘটিয়াছে। মানুষের জীবনে যদি পুরুষকারের কোন শক্তিই

না থাকিবে, তাহা হইলে মানুষের মনে সমালোচনায় প্রবৃত্তি বা যশাকাঙ্ক্ষা থাকিত না। পুরুষকার স্বীকার না করিলে মানুষ একদণ্ডও বাঁচিতে পারে না। যদি বলেন—"এ সব মহামায়ারি লীলা!" তবে বলিব যে, সে লীলা তো সর্ব্বত্রই আছে। তাহা হইলে, এ 'তুমি-আমি'-ভেদি বা কেন? এবং, অতই যদি বিধাতার প্রতি আমাদের নির্ভর তবে আজ এ 'স্বদেশী'র ছলনাই বা কিসের জন্য? বস্তুতঃ, পুরুষকারের প্রভাবে, কতক পরিমাণে দৈবকে খণ্ডিত করা অসাধ্য নহে,—সে কথা আমাদেবি যাগ-যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ণের দ্বারা আমবা বিশিষ্ট প্রকাবে বুঝিতে পারি। এ সকল উক্তি আমাদেব কুশিক্ষা ও অপদার্থতাবি পরিচায়ক;—ইহাতে সার তথ্যের ভাগ অতি অল্প। একটা কথা আছে—"দুর্ম্মতির ছলের অসদ্ভাব নাই"। আমিও বলি—তাহাই ঠিক; আমাদের প্রকৃতই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

ইংলণ্ডে, জাপানে ও অন্যান্য স্বাধীন দেশেও যে, জাতি-ভেদ প্রভৃতি একেবারে নাই, এমত নহে। কিন্তু, তাহা কুসংস্কার-মূলক নিয়ম-তন্ত্রে আচারবদ্ধ নহে। এটা আমাদের জানা চাই-ই যে, ব্যবহাবিক জীবনের আচাব-পদ্ধতি—সহজ বুদ্ধিতে—যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহা নহে, তাহা ঐরূপ ধর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত হইলেও, বিশেষভাবে কর্ম্মেই পর্য্যাপ্ত। যে সমুদয় সামাজিক রীতি কর্ম্ম-পথকণ্টক, বা জাতীয় জীবনের আবর্জ্জনা সে সকল পদ্ধতির মূলচ্ছেদ

না করা, জাতীয় জীবনের সর্ব্বথা প্রাণান্তকর। ব্যক্তিগত মনুষ্যের জীবনেও কোন কোন পূর্ব্বাভ্যাস কালক্রমে রোগের সঞ্চার করিয়া থাকে। তেমনি আমাদের জাতীয় জীবন পূর্ব্ব হইতে এখন সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থারি মধ্যে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহার সেই পূর্ব্বাভ্যাস-জনিত রোগ নাশ করিয়া, তাহার পূর্ব্ব সংস্কারগত, দৃশ্যমান বাধা-কণ্টকগুলিকে উৎপাটিত করিয়া দিয়া, তাহাকে সচল ও সজীব করিয়া তুলিতে হইবে।

এস্থলে, আর একটা ক্ষুদ্র কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিলাম। পূর্ব্বাপব ভ্রান্ত মত পোষণ বা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি বলিয়া, বুঝিয়াও,—অসঙ্গতির আশঙ্কায় বা চক্ষু-লজ্জার দায়ে—সত্যকে অস্বীকার করিব, এবং বিনা যুক্তিতে "ও মত কিছু না" বলিয়া উড়াইয়া দিব,—ইহা নিদারুণ উপহাস। আমি উপদেশক নহি, শিক্ষার্থী। আমার মত ভ্রান্ত হইলে গুণীজন তাহা বিদূরিত করিয়া দিলেই আমি অনুগৃহীত ও চির-কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু, আমি যুক্তি চাহি, সদালাপ চাহি। অকারণ আমার প্রতি রোষ-প্রকাশ করিলে, আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই দুর্ব্বহ হইয়া পড়িবে।

আমি একটু নিরপেক্ষভাবে, প্রসন্ন, প্রশান্ত মনে, এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। যাহা সুস্পষ্ট, কতকাল আর এমনি করিয়া,—ব্যক্তিগত কারণে বা

সাহসের অপ্রাচুর্য্য হেতু—তাহা দেখিয়াও, আমরা অন্ধ হইয়া থাকিব ? ইহাতে লাভ কি ? আমাদের এবম্প্রকার আচারণেও কি আমাদেরি নৈতিকবলের অভাব প্রতিপন্ন হয় না ? তাই, আমি আমার মনোগত বেদনা জানাইয়া, আমার জ্ঞান-বৃদ্ধগণের ও আমার সমরুধিরজীবী সহোদরবর্গের নিকটে, সরল অন্তরে আবার বলিতেছি যে, যতদিন আমরা এই জীর্ণ লোকাচারপূর্ণ সমাজের পঙ্কোদ্ধার না করিব, যতদিন পুনর্ব্বার তাহাকে বিশ্বের কর্ম্ম-স্রোতের সহিত সংযুক্ত করিয়া না দিব, যতদিন সূর্য্যালোক ও সমীর-প্রবাহকে তাহার বক্ষের উপর অবাধ অধিকার প্রদান না করিব ততদিন আমাদের উন্নতির আশা,—বিড়ম্বনা মাত্র! কারণ, তাহা না হইলে আমাদের একতার সম্ভাবনা নাই। আমাদের সমসুখ দুঃখ-ভাগী, একান্নভোজী মুসলমানগণকে আমরা যদি অদ্যাপি অন্ধ সংস্কারবশে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখি তবে তাহারা কখনই আমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিবে না, ইহা অতি ধ্রুব।

স্বদেশ-হিতকল্পে, সম্প্রতি একটিমাত্র নেতা-নির্ব্বাচনের জন্ত কোন কোন ভদ্রমহোদয়েরা অত্যধিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গতিই স্বাস্থ্য; তাঁহাদের এই প্রস্তাবের যুক্তিগুলির মধ্যে সঙ্গতি নিতান্তই অল্প। অতএব, ইহা স্বাস্থ্যকর প্রস্তাব নহে।

নেতাকে অমন অনুসন্ধান করিয়া, টানিয়া তুলিতে হইবে, না। যিনি নেতা তিনি আপন ক্ষমতাবলে, আপনিই জাগিয়া উঠিবেন। সম্প্রতি, আমাদের এবম্বিধ ব্যর্থ চিন্তা করিবার অবকাশ বা সুযোগের যথেষ্ট অভাব আছে।

এখন আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাকে কেন্দ্রস্থ করিয়া, কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে, মানি। কিন্তু, সে কেন্দ্রও আমাদিগকে একের মধ্যে সংকীর্ণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। দেশের কাজ—দশের কাজ। একের পক্ষে দশের হিত-চিন্তা করা, নানাকারণে কোনমতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা না জন্মিলে কর্ম্মের দায়িত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না—একথা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি আবার ইহাও চিরসত্য যে,যাবতীয় জাতীয় অভিজ্ঞতা এক জীবনে কখন অনুভূত হইতে পারে না। কারণ, অবস্থাই অনুভূতির—অভিজ্ঞতার জন্মভূমি, এবং এক জীবনে, সর্ব্বাবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করা ও সর্ব্বরূপে বোধ শক্তি স্ফুরিত হওয়া, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ সম্বন্ধে, দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। ধরুন,—এই চাষার চাষের অভিজ্ঞতা যত থাকিবে, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির

পক্ষে, তদ্বিষয়ে ততদূর অভিজ্ঞ হওয়া, একান্তই স্বভাব-বিরুদ্ধ। নেতা বা চালক যিনিই হউন না কেন—তিনিও মানুষ, তিনিও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কোন বিশেষ অবস্থারি মধ্য দিয়া,কোন বিশেষ বিভাগের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করিয়া, কোন বিশেষ বিষয়ের তীব্র অনুভূতি দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। এমতাবস্থায়, তাঁহার জীবন উক্ত বিষয়ের নেতৃত্ব লাভ করিলেও, অপরাপর বিভাগের নেতৃত্বের কোনমতেই যোগ্য হইতে পারে না।

আমাদের স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দেশ-প্রাণ, মহাত্মা ছিলেন। তিনি কবিতাদি লিখিয়া, দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধনো করিয়াছেন; এবং আজীবন ধরিয়া, দেশের দুর্দ্দশার কথা মর্ম্মান্তিক তীব্রতার সহিত অনুভব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহার জীবন, এই জটিল রহস্যপূর্ণ জাতীয় মহাজীবনের অসংখ্য বিভাগের নায়ক-যোগ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাণ ভরিয়া, "স্বদেশী"-কবিতার রসগ্রহণ তিনি করিতে পারিতেন, এবং তজ্জন্য, তদ্বিষয়ে তিনি অবশ্য নেতৃ-পদবাচ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু, দেশের দুরবস্থার কথা ব্যাকুল মনে,তন্ময় হইয়া ভাবিতে পারিতেন বলিয়াই যে,তিনি অন্য কোন বিষয়েও আমাদের নায়ক হইবার যোগ্য ছিলেন, ইহা মনে করিতে পারা যায় না। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পারদর্শিতা—সম্পূর্ণ ভিন্ন গুণ। তাঁহাকে দীর্ঘিকা-খননের জন্য, দুর্ভিক্ষ নিবারণোপায় জন্য,

খণিজ দ্রব্যের গুণাগুণ-বিচার ও তাহার মূল্য-নির্দ্ধারণের জন্ত, বা ব্যবসায় সংক্রান্ত পরামর্শের জন্ত কেহই কখন পারদর্শী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিজ্ঞতাই নায়কের যোগ্যতার প্রকৃষ্ট মান-দণ্ড। কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বিভাগে, আমরা কোন ব্যক্তি-বিশেষের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু, সে নেতাও সেই বিভাগে আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন ;—তাঁহাকে তল্লাশ করিয়া, কর্ণাকর্ষণ পূর্ব্বক 'কর্ণধার' করিয়া তুলিবার—দরকার নাই।

এই স্বদেশী-আন্দোলনের দিনে, রাজনৈতিক বিভাগে,শহর ও মফস্বলের শিক্ষিত জনেরা—এবং সেই সূত্রে অবোধ জনসাধারণো —প্রধানতঃ একজনেরি উপদেশানুসারে চলিতেছেন। এমন সময়ে, সহসা কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম করিলে তাঁহার প্রতি এই পরাধীন দেশের নৈতিক বল-শূন্য, স্বর-প্রধান লোকেরা সমা-লোচনার সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে থাকিবে ; এবং, তাহাতে তাঁহার প্রতিপত্তি ও গৌরব যেটুকুওবা আছে তাহাও খর্ব্ব ও ধূলীসাৎ হইয়া যাইবে। এইরূপে, নেতাকে বিদ্রূপভাজন করিয়া তোলা, আদৌ সুপরামর্শ নহে। এইরূপ আচরণেই 'হিতে বিপরীত' হয়! লোকের যে বিভাগের যেটুকু শক্তি স্বভাবতঃ কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে তন্মধ্যে এইরূপে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা, অবৈধ।

আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা, রুচি—সমস্তই অধুনা, যুক্তি-মূলক জীবনীশক্তি-প্রভাবে সচল হইয়া উঠিয়া, ভিন্ন ভঙ্গীতে, ভিন্ন খাতে, একটু ভিন্ন ভাবেই প্রবাহিত হইতেছে। সে স্রোতকে ফিরাইবার চেষ্টা, আজ শুধু ব্যর্থ নহে—অনাবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষা, প্রবৃত্তি বা অবস্থার হিসাবে—যে জাতিরি হোকনা কেন—কোন জাতিব বিশেষ কোন লোকের উপরেই আমরা নির্ভর করিতে পারিব না। সমাজেরো সে দিন নাই, আর বিশ্বেও ভিন্ন ধরণের বাতাস বহিতেছে।

বর্ত্তমানে, যতগুলি সচল বা উন্নতিশীল জাতি এ জগতে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেছে তাহারাও সম্পূর্ণরূপে একনেতৃত্ব মানিয়া চলিতেছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঐ জাপান ও রাশিয়ার প্রতি দৃষ্টি করুন। রাশিয়া তাহার চিরন্তন নিয়মো আজ বাধ্য হইযা পরিবর্ত্তিত করিল। তজ্জন্যই, মনে হয় যে, আমরা নেতৃত্ব মানিতেছি ও মানিব; কিন্তু, তাহা বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন জনের। একের খেয়ালে বা হুকুমে আমরা দলিত বা চালিত হইতে পারিব না,—সেরূপ আমাদের শিক্ষাই নহে। আর, সে শিক্ষাও হওয়া উচিত কিনা, গুরুতর সমস্যার কথা।

তদ্ভিন্ন, এসকল বিষয়ে, অন্ধ অনুসরণে শক্তি-ক্ষয়েরো আশঙ্কা আছে। অন্ধানুসরণ সমর-ক্ষেত্রের উপযোগী হইতে পারে;—কারণ, তাহা ঘোর উত্তেজনার সময়। কিন্তু, যেখানে ধীর-শান্ত

চিত্তে, প্রত্যেক কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বুঝিয়া, প্রত্যেক বিভাগের সুপথ আবিষ্কার করিয়া চলিতে হইবে সেখানে ঐরূপ এক-নেতৃত্বের উপাসনা, সাংঘাতিক। মানুষ অভ্রান্ত নহে; এবং, পূর্ণ মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্তও এ জগতে অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়াছে কিনা, বিবেচ্য।

আমরা এখন সাধ্যের মধ্যেই সফলতা খুজিব। যে বিভাগে যাঁহার যেটুকু সাধ্য সেটুকুর সাহায্য না লইয়া, সাধ্যাতীত কোন ভার তাঁহার মস্তকে চাপাইয়া দিলে, তাঁহার সাধ্যায়ত্ত বিভাগের ফল-লাভ হইতেও আমরা বঞ্চিত হইব; এবং, তাহাতে সকলি বিফল হইবে!

কাজেই, এই প্রকার অসম্ভব দায়িত্বের বোঝা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই গ্রহণ করিবেন না। ফলে, আজ ইঁহাকে—কাল উঁহাকে ধরিয়া টানাটানি করিয়া, যাঁহার যেটুকু প্রতিপত্তি ছিল তাহাকেও বিনাশের—ধ্বংশের পথেই লইয়া যাওয়া, সার হইবে! এমন করিলে প্রকৃত কর্ত্তব্যের প্রতি কাঁহারো চক্ষু পড়িবে তো না-ই;—তা'ছাড়া, এইরূপ মোহকর, ব্যর্থ চিন্তায় কাল কাটাইয়া আমরা কেবল জড়ত্বই প্রাপ্ত হইব।

হয়তো কেহ বলিবেন—"সাধারণে একটি মাত্র নেতা চায়। শিক্ষিত লোকদের অনুমত হইলে কি হইবে?" তদুত্তর—আগে শিক্ষিত লোকদের বিচিত্র শক্তিকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে সংস্থাপিত করিয়া, চালনা করিতে আরম্ভ করা হোক,—অজ্ঞানেরা ধীরে ধীরে

তাঁহাদেরি অনুসরণ করিতে উপযুক্ত ও বাধ্য হইবে। ব্যস্ততা; হুজুগ-প্রিয়তা, ভাব-প্রবণতা বা অমিশ্র যশোলিপ্সা দ্বারা দেশোদ্ধার হয় না। ইহা কর্ম্মক্ষেত্রের কথা ;—এখানেও সেই ক্ষণ-প্রভা কল্পনার সাহায্য-গ্রহণ করিলে চলিবে না।

এস্থলেও কেহ কেহ বাধা দিবেন—"আমাদের দেশের ঐ যে চিরন্তন প্রথা,—নেতার প্রবৃত্তি যে আমাদের জন্মগত !" আমি বলি—নেতা আমরা তো মানিবই ; তবে, তাহা একের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া নহে। এখনকার কালে, "প্রবৃত্তিরেষাভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" অন্যথা, ফল-লাভের আশাও—"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব" হইয়া পড়িবে।

এই 'স্বদেশী'র দিনে, আমরা 'স্বদেশী' অর্থে যদি নিজেদের সব ভালো, এবং অপরের সকলি মন্দ,—এইরূপ বুঝিয়া থাকি তবে আমাদের সর্ব্বনাশ অতি আসন্ন! উদারতা জাতীয় জীবনের নিশ্বাস-বায়ু। উদারতা দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া, অন্ধ মমতা কাটাইয়া, আমাদের প্রত্যেক গ্লানি ও মালিন্য ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে ; এবং বিচারপূর্ব্বক, স্থিরমতিতে পরের অনুকরণীয় গুণগুলি আপনার করিয়া লইতে হইবে। পরের যাহা ভালো তাহা নিজের করিয়া লওয়া, এবং নিজের যাহা মন্দ তাহা বর্জ্জন করিয়া, নিজের উত্তমের মধ্যেই আত্ম-নিষ্ঠ হওয়া,—অকৃত্রিম দেশ-হিতৈষীর স্বভাব।

সামাজিক।

সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বোপরে, এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আমার প্রবল প্রতিবাদ এই যে, এই প্রকার একনেতৃত্বাধীনে থাকিলে, আমরা হিন্দু-মুসলমান কখনো এক হইতে পারিব না। আমার এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্যই সেইখানে। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু-মুসলমান এক না হইলে জাতীয় উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারমার্থিক মার্গে, আমি এক-গুরুবাদ বা একনেতৃত্ববাদ অস্বীকার করি না। তাহার হেতু—পারমার্থিক জীবনের অধিকাংশই কল্পনা-মূলক; মানুষ তাহার অনেকটাই কল্পনার দ্বারা গড়িয়া লইতে বাধ্য হয়। এরূপ ব্যক্তিগত উপাসনা বা সাধনাকে আমি জাতীয় জীবনের উন্নতি-পথ-বাধা বলিয়া মনে করি না। এই অশান্তিপূর্ণ সংসারে, যে বিষয়ে, লোকে যে যেভাবে চিন্তা করিয়া তৃপ্ত হয়, সে সেই ভাবেই চিন্তা করুক,—এটুকু স্বাধীনতা না দিলে মানুষ মরিয়া যাইবে। কিন্তু, জাতীয় জীবনের বিভাগসমুদয়ের উপর সেরূপ একগুরু-বাদ বা একনেতৃবাদ স্বীকার করার পক্ষে, অসংখ্য অন্তরায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

আবার, শিক্ষিত লোকের পক্ষে, ব্যক্তিগত পারমার্থিক জীবনেও গুরুর বাক্যে না বুঝিয়া অন্ধ নির্ভর করিলে, তাহাতে প্রকৃত, অম্লান বিশ্বাস দীপ্ত হইয়া ওঠে কিনা; এবং, সে ভাবের

অন্ধ বিশ্বাসে উপকারের না অপকারের সম্ভাবনা অধিক,—সে সকল কথার আলোচনা আমি এক্ষেত্রে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই বিবেচনা করি। সুতরাং, সে সকল কল্পনা-মূলক, দুর্মীমাংস্য প্রশ্নের বিচার বা আলোচনা করিয়া আমি ব্যক্তিগত ভাবে, কাহারো অন্তরের সেই কোমলতম স্থানে আঘাত দিতে ইচ্ছুক নহি।

রোগ যখন শোচনীয়রূপে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় তখন রোগীর অনুভব-শক্তি একেবারেই বিলোপপ্রাপ্ত হয়; তখন তাহার ঔষধ সেবন করায়ো কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকে না। কিন্তু, তাহার পক্ষে, সে অবস্থায় ঔষধ সেবন না করা, সুপরামর্শ নহে। ঔষধ তাহাকে সেবন করিতেই হইবে; নতুবা, মৃত্যুই তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আমাদের এই দুরন্ত রোগ জন্মিয়াছে। এখন আমরা পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছি, তবু আমাদের অনুভব-শক্তি নাই! আমাদের শক্তি, চর্চ্চার অভাবে, নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। শক্তির বহির্বিকাশ কর্ম্মেই পরিলক্ষিত হয়। যে জাপানকে আজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের জাতীয় কবি হেমচন্দ্র "অসভ্য জাপান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন সেই জাপান এই অল্প কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিলেই

তাহার অসীম ক্ষমতার যথেষ্ঠ পরিচয় প্রাপ্ত হই। কিন্তু, আমরা কোন শুভ কর্ম্মে, আজ এই শত শত বর্ষের মধ্যে একটি বারের জন্যও যে আমাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারিলাম না, তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াও যদি আমবা উদাসীন থাকি তবে, আর আমাদের উপায় নাই। যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আমরা শয্যাশায়ী হইয়াছি তাহার প্রতিকার এখনি না করিলে, আমাদের শীঘ্রই চির-নিদ্রাভিভূত হইতে হইবে।

যে সমাজ জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে নবভাবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা, প্রয়োজন। তাহা না হইলে, বৃথা জাতীয় মহা-সমিতিতে গিয়া আমরা চীৎকার করিয়া মরিতেছি;—তাহা না হইলে, বৃথা আমরা প্রবন্ধ-রচনা করিয়া সময় ও চিন্তার অপ-ব্যবহার করিতেছি। আমাদেব ভিতরে জাগরণ কই?—প্রাণ কই? আনন্দ কই? উৎসাহ কই?—আমাদের সকলি গিয়াছে। তথাপি, আমরা আজো আপনাদেব সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামিটুকু ছাড়িলাম না,—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপেব কথা আর কি হইতে পারে!

অতীতে বড় ছিলাম,—অতীতে আমবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া এ জগতে মান্য হইয়াছিলাম ইহাতে নিজেদেব কোনই বাহাদুরী নাই। ওরূপ উক্তি আমাদের বর্ত্তমান অপদার্থতারি পরিচয় প্রদান করে। যে মাতাল হইয়া লোকেব সর্ব্বনাশের কারণ

হইয়াছে বা ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছে তাহাকে দণ্ডিত করিবার সময়ে, সে যদি বলে—"ওগো, আমি যে-সে লোকের বংশধর নহি; —আমাব প্রতি এইরূপ আচরণ করিও না।" তবে, তাহাতে বিচারকের ঘৃণাই বর্দ্ধিত হয়; এবং সেই সঙ্গে, নিজের পূর্ব্বপুরুষগণেরো মাথা হেঁট হইয়া পড়ে। নীচবংশে জন্মিয়াও যদি কেহ উন্নত হয় তবে তাহার গৌরবের কারণ আছে। কিন্তু, উচ্চবংশে জন্মিয়া যদি অবনত হয় তবে তাহাতে মহত্ব কিছুমাত্র নাই।

তাই বলিতেছি—অতীতের সেই পুণ্য-স্মৃতিকে যদি সহায় করিয়া উন্নতি লাভ করিতে চাও, উত্তম। অন্যথা, অধমের পক্ষে, লোকের কাছে অতীতের বড়াই করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে যাওয়া, নিতান্তই অশোভন। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক—উভয় ক্ষেত্রেই এ কথাটা স্মরণ রাখা, বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

যে বলবান সে অত যেখানে সেখানে বল-প্রচার করিয়া বেড়ায় না,—সে ধীর ও সহিষ্ণুই হয়। কিন্তু, যে দুর্ব্বল —অন্তঃসারশূন্য সে-ই শত প্রকারে দর্প ও তেজ ফলাইতে চায়; এবং, যেখানেই বেগতিক দেখে সেইখানেই অতি সহজে কাঁদিয়া ফেলে, কিম্বা সুবিধা পাইলেই দেয় "চম্পট পরিপাটি"!—কি অন্তর্জগতে কি বহির্বিশ্বে ইহাই অবিচ্ছিন্ন নিয়ম। উপমার অসদ্ভাব নাই।—যাহার নাই সে-ই এক টুকরো রঙ্গিন্ সিল্কের

সামাজিক

জামা সংগ্রহ করিতে পারিলে, নানা উপায়ে—তাহা হেলিয়া দুলিয়া যেবকম করিয়াই হোক্,—লোককে দেখাইতে ব্যগ্র হইয়া ওঠে; কিন্তু, যাহার আছে সে অত কৃত্রিমতার ভাণ করে না,—সে অতি স্বাভাবিক ভাবে, চাদর দিয়া সে জামাটা বেশ ভদ্রের মতই ঢাকিয়া লোকালয়ে চলাফেরা করে। বিপুলকায় যে হাতি সে একটু বিরক্তির কারণ পাইলেও তাহা শুঁড় ঘুরাইয়াই উড়াইয়া দেয়; কিন্তু মশার স্পর্দ্ধার জ্বালায় বড় বড় মানুষেরাও জ্বালাতন হইয়া পড়ে। উপমা দিয়া বা যুক্তি দিয়া,—নানা উপায়ে এ তথ্যটি বোঝানো কিছুমাত্র শক্ত নহে যে, সক্ষম কখনো গৌরব প্রকাশের জন্ম লালায়িত হয় না। জাপান এই যে এতদূর জয়ী হইয়াছে, তজ্জন্ম সে ঢাক পিটাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, উল্লাস প্রকাশের দ্বারা "নিজ মহিমা দেশ-বিদেশে গাহিয়া" বেড়ায় নাই;—সে অবিচলিত দৃঢ়তা ও আত্ম-সংযমের দ্বারা আপনার কাজ করিয়া যাইতেছে।

উদারতা, সংযম ও স্থৈর্য্যই কর্ম্মীর—বলীর—শক্তের অভ্রান্ত লক্ষণ। চাঞ্চল্য ও চপলতা, গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা দুর্ব্বলের—অক্ষমের—অযোগ্যেরি নিদর্শন।

বর্ত্তমানে, যে সকল দুরবস্থা আমাদের কতকাংশ অজ্ঞতাধীন রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন প্রতিকার-চেষ্টা না করিয়া, "হোমরুল" পাইলাম না—অদ্বিতীয় নেতা মিলিল না; সুতরাং, কি আর

করিব।”—এইরূপ কথা বলা কেবল যে আমাদের চপলতার পরিচায়ক, তাহা নহে; এই সকল কথা আমাদের কিছু না করিবার একটা ওজর, একটা ছলনা, একটা ভাণ মাত্র।

এখন সকলে আমাকে চাপিয়া ধরিতে পারেন—“তবে, তোমার কথায় সঙ্গতি কোথায়? তুমি “হোমরুল” চাহ না, একনেতৃত্বও মানিতে রাজি নহ—তবে তুমি কি চাহিতেছ?” আমার নিবেদন—আমার একটা সঙ্গতিপন্ন, সামঞ্জস্যপূর্ণ মত আছে, তবে, তাহা পরস্পর-বিরোধী নহে। আমি কোন মতেরি গোঁড়া হইতে চাহি না। যাহার মধ্যে যেটুকু সত্য ও সুন্দর, আমি তাহাই গ্রহণ করিতে চাই।

আমি বলি—সমাজেই হৌক্, আর রাজনীতিতেই হৌক্,—আমাদের যেটুকু ভালো, আমরা যেন সেইটুকুকেই গ্রহণ করি; এবং যেটুকু ভাল নহে, তাহা যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে পরিত্যাগ করি। অন্ধমোহবশে যাহা গর্হিত তাহার উপর নির্ভর করিলে, আমরা নিশ্চিতই অতি নিরবলম্বভাবে বারংবার বিড়ম্বিত ও বিপন্নই হইতে থাকিব, তাহাতে আমাদের কখনই মঙ্গল হইবে না। আমি কি চাই—আমার প্রধান আশা কি, তাহা নাকি প্রকাশ করিলে অপরাধ হয়। সুতরাং, সে কথাটি এখন থাক্। তবে, এখন আমি চাহি—যোগ্য হইতে, সুস্থ হইতে, এবং স্বস্থ বা আত্মস্থ হইতে। আগে আমরা আমাদের নিজেদের আয়ত্তাধীন আর্থিক,

 সামাজিক।

সামাজিক ও নৈতিক সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উন্নত হইতে থাকি, ক্রমে, যেন "হোমরূল" প্রভৃতির জন্য উৎসাহ প্রকাশ করি।

আমার মতে, আমাদের বিভিন্ন বিভাগে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত, একটি স্থায়ী সমিতি থাকিবে। এই সকল সমিতি বা নেতৃগণ কোন ব্যক্তি বিশেষের মারফৎ—সর্ব্বসাধারণকে চালনা করিবার জন্য—তাঁহাদের উপদেশাবলী প্রচার করিবেন। কিন্তু, যাঁহার মারফৎ এই সকল উপদেশ প্রচারিত হইবে তাঁহার দায়িত্ব—বিশেষজ্ঞের দ্বারা গঠিত, এই সকল বিভিন্ন বিভাগীয় নায়কবৃন্দের অধীন হইয়া থাকিবে। তাঁহার শক্তির সীমা থাকিবে, এবং তিনি যথেচ্ছভাবে কোন আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন না।

বিপ্লব স্বাস্থ্য নহে, সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যই স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়াই আমরা উন্নত হইব,—ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আন্তরিক অভিলাষ।

(গ) নৈতিক ও পারমার্থিক।

নৈতিক ও পারমার্থিক—এই দুইটি স্বতন্ত্র বাক্য গৌণভাবে, মুখ্যতঃ অভিন্ন বলিয়াই আমি এতদ্বয়কে একটি অভাবরূপেই গণ্য করিলাম। ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টিই সমাজ। সেই ব্যক্তিগত জীবনে, সর্কৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক কোন শক্তির প্রতি বিশ্বাস থাকা, একাধিক কারণে একান্ত আবশ্যক। তর্ক-প্রসঙ্গে অন্যান্য হেতু ছাড়িয়া দিতে না হয় সম্মতই হইলাম; কিন্তু, ইহা নিতান্তই অভ্রান্ত যে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও কল্যাণার্থ সামাজিক প্রত্যে- মনুষ্যের ব্যক্তিগত জীবন এবম্প্রকার কোন অপার্থিব, অদৃষ্ট শক্তির প্রভাবে নিয়মিত ও চালিত না হইলে, সমাজের যথেষ্টই অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। অতএব, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এই শক্তির বিভিন্ন স্বরূপ বা বৈশিষ্ট মানিয়া লইয়াও, ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হইব যে, এই দুর্বোধ্য রহস্যাচ্ছন্ন সংসারে, পারমার্থিকতার প্রভাবেই মানবের মনোবল বা নৈতিক বল সর্ব্বথা—প্রতিনিয়তই সঞ্জীবিত হইতেছে। এই কারণেই, আমি এতদুভয়কে পৃথক্-ভাবে দুইটি অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম না।

নৈতিক।—আমাদের আর্থিক ও প্রধানতঃ আমাদের সামাজিক চিন্তার ভিতর দিয়াই আমরা আমাদের নৈতিক অধঃপতনের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা যে আমাদের এই

ভীষণ দুরবস্থার সর্ব্ববিধ কারণ হৃদয়াঙ্গম করিয়াও, অদ্যাপি জড়ের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া আছি।—এতদ্দ্বারাই আমাদের নৈতিক শক্তির অভাব বোধগম্য হইতেছে। এ সম্বন্ধে, আর বেশী কিছুই বলিবার নাই।

একদিকে যেমন এই নৈতিক শক্তি সেই মহাশক্তি দ্বারা উদ্বোধিত হইতেছে তেমনি আবার অপরদিকে আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে এই নৈতিক বল-লাভের পক্ষে—উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে—"শক্তির বিকাশ কর্ম্মেই লক্ষিত হয়।" শক্তি নিস্তেজ হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ চর্চ্চার অভাবই বটে; কিন্তু, জিজ্ঞাস্য এই যে, এই চর্চ্চার অভাবই বা ঘটিবার কারণ কি? ইহার কারণ দুইটি।—প্রথম, আমাদের ভগবানে অবিশ্বাস, দ্বিতীয়, আমাদের কুশিক্ষা বা অনুপযোগী শিক্ষা। শিক্ষা যদি দেশ, কাল ও পাত্রের কোন সন্ধান না লইয়া প্রচলিত হয় তবে তাহাতে কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক কোন জীবনেরই উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। এতকাল সেইভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। আজ আমাদের মতি ফিরিয়াছে। তাই, আজ দিক্‌ভ্রান্তেরা ঐ "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে"র কল্পিত প্রাঙ্গণে, মনোময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশায় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। এতদুপলক্ষে, মহাত্মা তারক পালিত মহাশয়ের অতুল স্বার্থত্যাগের মহতী স্মৃতি আজ এই অধঃপতিত বাঙালীর অন্তরকে শ্রদ্ধায়—বিস্ময়ে—গৌরবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

এক্ষণে, আমাদের পুস্তকগত বিদ্যাকে কর্ম্মগত জ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের আধুনিক শিক্ষা কল্পনা ও সমালোচনাতেই নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। যদি এই সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের ভার পর হস্ত হইতে আমাদিগকে স্বহস্তেই গ্রহণ করিতে হয় তবে আমাদের নৈতিক বল-সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে, এই স্বদেশী শিক্ষাকে কর্ম্মমুখী ও অভিজ্ঞতা-মূলক করিয়া তুলিতে হইবে। "শিক্ষা-পরিষৎ" যদি সার্থক হইতে চাহেন তাহা হইলে, বর্ত্তমানে, তাঁহাদিগকে শিল্প বিজ্ঞান-কৃষি প্রভৃতি বিভাগের প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। তদ্ভিন্ন, সম্প্রতি এ বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব লাভের উপযুক্ত, প্রচুর পরিমাণে শিক্ষার্থী মিলিবে কিনা, সন্দেহ।

ক্রমে, রুচি, অভ্যাস ও আবশ্যকের সঙ্গে সঙ্গে, ধীরে ধীরে আমরা এ অনুষ্ঠানটির পূর্ণাঙ্গ সাধন করিতে পারিব; এবং এই রকমেই, ক্রমে ক্রমে, আমরা নৈতিক শক্তি-সঞ্চয়ের যোগ্য হইতে পারিব।

অতঃপর, পারমার্থিক মার্গে আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য সর্ব্বোপরে, একটি মাত্র প্রশ্ন করিয়াই আমার এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব।

পারমার্থিক।—

আমি জিজ্ঞাসা করি—আমরা অনুভূতির সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে,

তেমন করিয়া কি আমাদের প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়, অস্তিত্ব-ময় দেবাদিদেবের চিন্তায় দিনান্তে একবারো আত্ম-নিবিষ্ট হই?—না, তাহা নহে। স্বীকার করি, উঠিতে বসিতে হিন্দু নানাভাবে ঈশ্বরোপাসনা করে। কিন্তু, সে সকল আচার-ব্যবহারের অন্তস্তলে প্রাণের লীলা—অনুভূতির ক্রিয়া দেখিতে পাই না, আমরা অন্ধ সংস্কার বা অভ্যাসবশতঃই ঐ সকল আচরণ করিয়া থাকি,—বস্তুতঃ, তাহার মধ্যে দেবতা নাই' এই সকল আচারের 'কাঠামো' হইতে ঠাকুর আমার—বহুদিনি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন! এখন আমরা শুধু বংশগত অভ্যাস নিবন্ধন, মোহ-ভরে, সেই দেবতাশূন্য খড় ও মৃত্তিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছি। হায়—একি ভয়ঙ্কর আত্ম-বিস্মরণ!

এই বিশ্ব-সংসারের অনাদি পরিচালন প্রতিপালন-সৃজন-সংহারের সেই হেতুভূত শক্তিস্বরূপ দেব-মহেশ্বরকে যদি আমরা প্রতিদিন এ জীবনে, একটিবারের জন্য—পলকতরেও ধ্যানায়ত্ত রাখিতে পারিতাম তবে আমাদের আজ এই দ্রুতগতি মরণমুখী, শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না,—তাহা হইলে আজ আমরা কখনই এতদূর হেয় হইতাম না। সত্য বটে, শান্তি ও কল্যাণ ভারতের মূল লক্ষ্য। কিন্তু, ঘুম-ঘোরকে আমাদের পিতামহগণ শান্তি বলেন নাই, এবং, স্ব-স্ব পরিবারস্থ স্ত্রী পুত্র-পরিজনের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানকেই তাঁহারা কল্যাণের চরমাদর্শ বলিয়া গণ্য করেন

নাই। তাঁহারা সমাজ-হিতকল্পে, বহিঃ-প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃ-প্রকৃতির "মঞ্জস্য" বা সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, শান্তি ও কল্যাণ সংস্থাপনার্থ আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, এবং, প্রেমের সুদৃঢ় বন্ধন-রজ্জুতে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত সমাজ-প্রকৃতিকে—জাতীয় প্রকৃতিকে সংযুক্ত রাখিয়া, ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য, বারংবার আমাদিগকে উঠিতে, জাগিতে, এবং কর্ম্ম করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের যে জাতীয় আদর্শ ছিল, জগতে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু, কুলাঙ্গার আমরা,—সে আদর্শকে ভুল বুঝিয়াছি। আমরা শান্তির যে আদর্শ ধরিয়াছি, তাহা তামসিকতার প্রকার ভেদ মাত্র। তাই, আমরা আজ ভ্রান্তির বশে, ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে ধাইয়া চলিয়াছি। ইম্পীরিয়াল য়্যাঙলো-ইণ্ডিয়ানের দল যখন চুণোগলির ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া, তাহাদের সেই সক সক ঠ্যাং দু'খানি তুলিয়া, অনায়াসে, অবজ্ঞাপূর্ব্বক সনাতন হিন্দু জাতির প্লীহার প্রতি নীতি-বিগর্হিত আচরণ করে, যখন ট্রেণে এবং ষ্টীমারে, পথে এবং গৃহে—সর্ব্বত্র, বর্ব্বর গোরাদের প্রবল অত্যাচারে আমরা সর্ব্বদা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া, শঙ্কিত, দুর্ব্বহ, লাঞ্ছিত জীবন ভার বহন করিতে থাকি, যখন ক্রূরমতি বর্জ্জনের ন্যায় দেশ-শাসক আসিয়া, আমাদের ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রকৃষ্ট উপায় সকল উদ্ভাবন করিয়া, আমাদের প্রাণের গভীরতম স্থানে অতি প্রচণ্ড আঘাত করিতে বিন্দুমাত্রও মমতা

প্রকাশ করে না—তখন আমাদের এ শান্তি কোথায় থাকে। ইহাই যদি শান্তির চরমাদর্শ হয় তবে ভারত-মহাসাগরে জীবন বিসর্জ্জন করিলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায়ে—আমরা চির-শান্তি লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই

আমাদের লজ্জা নাই,—সঙ্কোচ নাই,—অপমান নাই। আমরা এখন উন্নতির জন্য আত্মদোষ সকল স্পষ্ট করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিব, এবং আমাদের এ জীর্ণ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার করিতে তৎপর হইব। আমাদের সুখ, শান্তি, আশা কোথায়?—আমরা হতভাগ্য হইয়াছি। কিন্তু,—হায়, তবু "এ সাধের ঘুমঘোর" ভাঙ্গিল না।

ব্যাধি ও প্রতিকার।

ব্যাধি ও প্রতিকার।

বন্দে মাতরম্।

ব্যাধি ও প্রতিকার।

জাতীয় উন্নতি মার্গের অন্তরায়গুলি ও তদপসারণের উপায় সম্বন্ধে, আমার কথিত আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইস্থলে নিবন্ধ করিয়া, আমার বক্তব্যের একণে উপসংহার করিতে অভিলাষ করি। হিন্দু ও মুসলমান যতদিন এক মায়ের যমজ সহোদররূপে, নিবিড় সম্বন্ধ-সূত্রে অভিন্ন-হৃদয় না হইতে পারিবে ততদিন আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের অন্য কোন পন্থা আছে বলিয়া আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

ব্যাধি-নির্ণয়।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—আমাদের এ অধঃপতনের প্রধান কারণ—

(১) হিন্দু ও মুসলমানে অনৈক্য বা একতার অভাব।

এই অভাবের হেতু

(২) ভ্রান্ত বুদ্ধি-পরিচালিত অসংযত শক্তি।

এই শক্তি-বিপর্য্যয়ের হেতু

(৩) নৈতিক বলহীনতা।

প্রতিকার-চিন্তা।

আপাততঃ সামান্যভাবে দেখিলেও এ কথা প্রকৃত যে, প্রত্যেক

মনুষ্যের ব ক্তিগত জীবনে, ঐশী শক্তিতে নির্ভর ও বিশ্বাস না থাকিলে, মানুষ সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে পারে না। সুতরাং,—প্রথমতঃ

(১) ভগবতী শক্তি বা সর্ব্বময়ী প্রেরণা

শক্তি বা সর্ব্বভূত-সংস্থিতা সেই মহাশক্তিতে বিশ্বাস থাকা চাই। শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিলে পর, ক্রমে, সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধ জন্মিবে, এবং তখন

(২) আত্ম চিন্তা

করিয়া, আমাদের হৃদয়ে আমাদের এই দারুণ দুর্গতির বিষয়ে তীব্র

(৩) অনুভূতি

আনিতে হইবে। তীব্র অনুভূতি আসিলে, ক্রমে চেতনা জাগিবে ও তৎসঙ্গেই আমাদের মনোমধ্যে

(৪) কর্ম্মে প্রবৃত্তি

উদ্রিক্ত হইবে। এবম্বিধ সদিচ্ছার উদ্দীপনায় যখন আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিব তখন আমাদের

(৫) নৈতিক বল-লাভ

ঘটিবে। সেই নিদ্রিত মনোবলকে জাগ্রত করিয়া, আমরা ধীরে ধীরে, অতঃপর

স্বদেশানুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠা।

আরাধনা করিতে আরম্ভ [illegible] সাধনার পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রেই কাপট্য পরিহার করিয়া, আমাদিগকে

(৭) সরলতা

অভ্যাস করিতে হইবে। এই সরলতা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই, আমাদের এই তিমিরাবৃত মনোরাজ্য এক অপূর্ব্ব, দিব্য, স্বর্ণ জ্যোতিতে মহিমান্বিত হইয়া উঠিবে। সে আলোকের নাম—

(৮) উদারতা।

এই ঔদার্য্য-বর্ত্তিকার সাহায্যে, আমরা একপক্ষে যেমন

(৯) সংযম

লাভ করিতে পারিব, অন্যদিকেও আবার তেমনি আমাদের মধ্যে

(১০) সমপ্রাণতা বা সহানুভূতি

স্ফুরিত হইয়া উঠিবে। এই দশম অনুভূতি স্ফুট হইলেই আমরা

(১১) বিলাস-বর্জ্জন ও স্বার্থত্যাগ

করিতে বাধ্য হইব এবং প্রকৃত পক্ষে, তখনি আমরা আমাদের অস্তিত্বকে সার্থক করিবার জন্য অনন্যমনে এক হইয়া, আমাদের এই—

(১২৮) ব্যবহারিক জীবনের সামাজিক সঙ্কীর্ণ আচার-পদ্ধতির শৈথিল্য সম্পাদনার্থ কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইব।

উপরোক্ত ব্যাধিগুলির নিবৃত্তি সাধন করিতে হইলে, যাহার যে সকল উপায় অবশ্য-গ্রাহ্য বা যে সমুদয় বিধি অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া আমার মনে জাগিয়াছে—তাহাই এস্থলে প্রকটিত করিলাম। যত দিন পর্য্যন্ত ইহার প্রত্যেকটি আমরা গ্রহণ করিয়া, সর্ব্ব-গুণান্বিত হইতে না পারিব ততদিন যে আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট হইয়া, বসিয়া থাকিতে হইবে, এমত নহে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রতিকারগুলি পরস্পর-সাপেক্ষ। একের উদ্গমে অন্য গুলিও সহজাত হইয়া উঠিবে। দেখিতে সে গুলি প্রথমতঃ, আমাদের পক্ষে একান্তই দুষ্প্রাপ্য বোধ হইবে, কিন্তু, ঐকান্তিক ইচ্ছা-শক্তির নিকটে, এ জগতে সকলি ক্রমে সম্ভব হইয়া আসে। কর্ম্মগত-প্রাণ যাঁহারা তাঁহাদের অন্তরে এই সকল অনুকূল সৎ-প্রবৃত্তিগুলি এতই সহজে, একের পর অন্য,—এককালেই, প্রতীত হয় যে, তাহা ঐ সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ আপনারাই জানিতে পারেন না।

এ বিশ্ব-সংসারে, গুণের জন্য কাহাকেও কখন বসিয়া থাকিতে

হয় না। কর্ম্মেই গুণের বিকাশ, এবং কর্ম্মের দ্বারাই গুণানুশীলন করিতে হয়। আমরাও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উল্লিখিত, [illegible] গুণরাশি সঞ্চিত করিতে পারিব। তবে, সর্ব্বাগ্রে ঐকান্তিকতা, প্রয়োজন।

শাস্ত্রে আছে—

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ"—

তাঁহাতে যেমন আমাদের প্রীতি থাকা চাই তেমনি তাঁহার 'প্রিয় কার্য্য'—অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্যগুলিও—সম্পাদিত করা চাই। তাঁহাতে প্রীতি না জন্মিলে, তাঁহার 'প্রিয়কার্য্য সাধন' করা যায় না,—আবার তাঁহার 'প্রিয় কার্য্য' সাধন ব্যতীতও তাঁহাতে প্রীতি সঞ্জাত হয় না।

অতএব, কর্ম্মে ও চিন্তায় সঙ্গতি রক্ষা করার নামই মনুষ্যত্ব বা যথার্থ মানব-ধর্ম্ম। তাঁহাতে মতি স্থির রাখিয়া, আমাদিগকে কর্ম্ম-পথের সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-বিপত্তিকে উৎপাটিত করিয়া, কর্ত্তব্য পালনে মন-প্রাণ উৎসৃষ্ট করিয়া দিতে হইবে। "নান্যঃপন্থা"।

[illegible]চার পূর্ব্বক, আ[illegible] চিন্তা করিয়া, অবনতির কারণ বুঝিলাম। এইরূপ, ধীরে ধীরে, দৃঢ়-সঙ্কল্প সহকারে, আমাদিগকে দৈন্য দূরীকরণের জন্য উ[illegible]সাধনায়, অবিলম্বেই বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে।

ক্রমে, [illegible] ফুরাইয়া আসিল।

২

ব-দে মাতরম্।

আমাদের ঐহ।পূর্ববঙ্গের প্রতিভাবান্ কবি প্রমথনাথ গাহিয়াছেন,—

"কি সুখ-শয়নে ভবনে ভবনে
মগ্ন আছ স্বপ্ন-ভরে ?
দেখিছ না চেয়ে আবর্জ্জনা বে'য়ে
আগুন লেগেছে ঘরে।"

আগুন যে বাস্তবিকি লাগিয়াছে তাহা আর অস্বীকার করা, চলে না। সে আগুন আমাদেব গায়ে উত্তাপ ও উল্কাকণা বর্ষণ করিতেছে।—এখন আমরা যদি বাঁচিতে চাই তবে উঠিতে হইবে, জাগিত হইবে, এবং সর্ব্বগ্রাসী এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া, আমাদের সর্ব্ব আবর্জ্জনারাশি ঝাঁটাইয়া ফেলিতে হইবে।

হে আমার চীরবাসিনী, অশ্রু-সেক-শীর্ণা, রাজরাজেন্দ্রাণী জননীর এই ভীষণ অশিব-রাত্রের দীপ্যমান প্রদীপ-সূত্র, —হে আমার পর-পদ-পেষিতা মাতৃদেবীর ধূলি-ম্লান, ছিন্ন অঞ্চলের অমূল্য রত্ন-নিধি বঙ্গের ছাত্রগণ, তোমরাই আজ এ সুপ্ত বঙ্গে, জাগরণের অশ্রুত-পূর্ব্ব তূর্য্য নিনাদে [illegible] চেতনা বিধান করিতে যত্নবান হইয়াছ। অভাগী, চিরদুঃখিনী আর্য্য-জননী [illegible] আমার—ঐ দেখো প্রভাত-[illegible] শি[illegible]-কাকলী শুনিতে পাইয়া, উৎকর্ণে, এই জীর্ণ-শীর্ণ দেহে, আজ আগ্রহাতি-

পদে যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ঐ জ্যোতির্ময়ী কলঙ্ক-লেশশূন্য বঙ্গদেবীর প্রতি আশা-বিহ্বল কম্পিত হৃদয়ে, সোৎসুক আঁখি মেলিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চাহিয়া আছেন। তোমরাও কি তাঁহার এই রুদ্ধ কণ্ঠে। দারিদ্র্য, এই দুঃসহ, দারুণ দুরবস্থা বিদূরিত করিয়া দিবে না? তোমরাও কি এই সুদীর্ঘ তমসাবৃতা, ঘনঘোরা রজনীর অবসান চিরাবসান আনয়ন করিবে না? যুগ জীর্ণা মাতৃমূর্ত্তি আজ যে বড় আগ্রহে—বড় আশায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হে অনাথ নমস্য ভ্রাতৃগণ, রক্ষা কর। মায়ের এই আগ্রহ-বিহ্বল, ক্ষীণ প্রাণ আজ তোমরা নিরাশায় দিগ্ধ করিয়া, নিমেষমধ্যে নির্ব্বাপিত করিওনা। তোমরাই আশা দিয়া, তাঁহাকে এইরূপ অতিমাত্র উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছ,—সুহৃদবৃন্দ, তোমরাই আজ তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিবে। হে বঙ্গের ভবিষ্য-ভরসা, তোমরাই আজ যেন মাতৃহত্যা করিও না;—বিশ্বপূজ্য আর্য্য প্রকৃতির তোমরাই যেন আবার প্রাণ-সংহার করিওনা। ওঠ, ওঠ প্রাণ-প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরাই ওঠ। তোমাদের দ্বারাই এ লাঞ্ছিত ভারতে, আবার নব-জাগরণ স্ফুরিত হইয়া উঠিবে। ভগবান তোমাদের সহায়,—সত্য তোমাদের সহায়,—ধর্ম্ম তোমাদের সহায়। জাগুক্ এ বীরপ্রাণগুলি,—ভারতের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক পুনরুত্থান তাহাদেরি দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

---

১১ ব্যাধি ও প্রতিকার।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় সর্ব্বশেষে এই উক্তি করিয়াছিলেন—

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥"

(হে অর্জ্জুন,) তুমি বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগাশ্রয়ে আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর।

কর্ম্মরাজ্য—জাতীয় জীবনের সকল গ্লানি—সকল আবর্জ্জনা প্রক্ষিপ্ত করিয়া, আমরাও পুনরায় একতাবন্ধনে বিশ্বের সহিত আমাদের আত্মাকে সংযুক্ত রাখিয়া, বিশ্বে শান্তি এবং কল্যাণ স্থাপিত করিব; এবং, সর্ব্বকর্ম্মের কারণস্বরূপ সেই প্রেমময়ে আমাদের সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, তাঁহাতেই আমাদের চিত্তসমাধান পূর্ব্বক, ভূমানন্দ লাভ করিয়া আমাদের এ জীবন ব্রত উদ্‌যাপন করিব। অধুনা, যে চিন্তা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল—তাহাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

ভগবান আমাদের শুভকার্য্যের সহায় হউন!

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী !"

ত

ঊর্দ্ধে তুলি' দুই হাত   কর তাঁ'রে প্রণিপাত।

তাঁ'রে সাক্ষী রাখি' বল,

"অটল এ পণ—

তুচ্ছ করি' ক্ষুদ্র প্রাণ   জননীর অপমান

ঘুচা'বই মোরা সবে

সঁপিয়া জীবন।"

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত

গীতি-কাব্য

অর্ঘ্য

কয়েকটী সংবাদ ও মাসিক পত্রের অভিমত :—

"* পাঠ করিয়া সত্য সত্যই শান্তি লাভ করিলাম্।

—বসুমতী।

"* যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। *"

—সময়।

"* কবির মৌলিকতা মৃগনাভির মত সৌরভ-সম্পদশালী।*"

প্রতিবাসী।

"* A dawning genius *—The Amrita Bazar Patrika

"* কবি কাব্য-সংসারে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবেন। *"

বাঁকুড়া-দর্পণ।

"* কবিতায় লালিত্যের পারিপাট্য আছে। রচনা ভাব-বহুল। *"

—জন্মভূমি।

"* Who is to be the poet of the regenerated India? * To the young poet whose verses we are reviewing, we can offer no nobler career, or one more worthy of the gifts, of which there is so

much evidence in the book before us The style of the author is simple and sonorous, his thoughts pure and elevating. *" —The Bengalee.

"* দেবকুমার দেবীণঙ, কাব্যরাজের [illegible] ফু কুসুম। * গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড উজ্জল।" —নব্যভারত।

"* The young author has, however, not only shown that he has in him those tendencies of life which can stimulate and inspire the higher instincts of men and contribute towards their steady growth and development, but also, that he has in him the instinctive genius of a poet,—that nature had sown in him, with all the care of a kind mother, the seeds of a life which is pre-eminently fit for metrical composition. * "Arun" is verily the down of that glorious day. * It will live, for, it is, verily 'a thing of beauty!' *"

—The Indian Mirror

উক্ত গ্রান্থকার-প্রণীত

অপর গীতি-কাব্য

প্রভাতী

অসংখ্য সমালোচনার দুই একটী মাত্র
এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"* আমরা এমন সরল, সুন্দর, পবিত্র, উচ্চভাবপূর্ণ কবিতা অতি কমই পড়িতে পাই। * কোনটি ছাড়িয়া কোনটি উদ্ধৃত করিব?—আগাগোড়াই উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করে। *"

—বসুমতী।

"* প্রভাত-শিশির-সিক্ত পুষ্পপুঞ্জসম মনোমদ। *"

—বঙ্গবাসী।

"* এই কাব্যনদী সরল, স্বাভাবিক ভাবে বহিয়া গিয়াছে। বিলাস-লালসার গন্ধমাত্র না থাকিলেও, রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা ইহাতে অবগাহিত হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। *"

—সময়।

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"* অতি সুন্দর। ভাষা যেমন সরল, সুন্দর, অর্থপূর্ণ; ভাবও তেমনি পবিত্র, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। *"

কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—"* মোটের উপর খুবই ভালো লাগিয়াছে। *"

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন,—"* প্রভাতী পড়িয়াছি ; ততোধিক সৌভাগ্যের কথা, বুঝিয়াছি। এখনকার বাঙ্গালা কবিতা প্রায়ই বুঝিতে পারিনা।" এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমিও বলিতে পারি—

"ষাটি বর্ষ মম, পড়িলে তথাপি
শিরায় শিরায় শোণিত নাচে।"

প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়,
৪১নং সুকীয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।